

বৌদ্ধ-প্রবন্ধ

“বুদ্ধের জীবন ও বাণী,” “ভারতীয় সাধক,” “শিখগুরু ও শিখজাতি,”
“শিবাজী ও মারাঠা জাতি,” “গুরুকত্তা,” “বঙ্গ-গৌরব স্তর
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ও বোলপুর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের

ভূতপূর্ব শিক্ষক

শ্রীশরৎকুমার রায়

বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ-প্রণীত

প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, বি, এ

১৩ নং শ্রীমাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯২৩

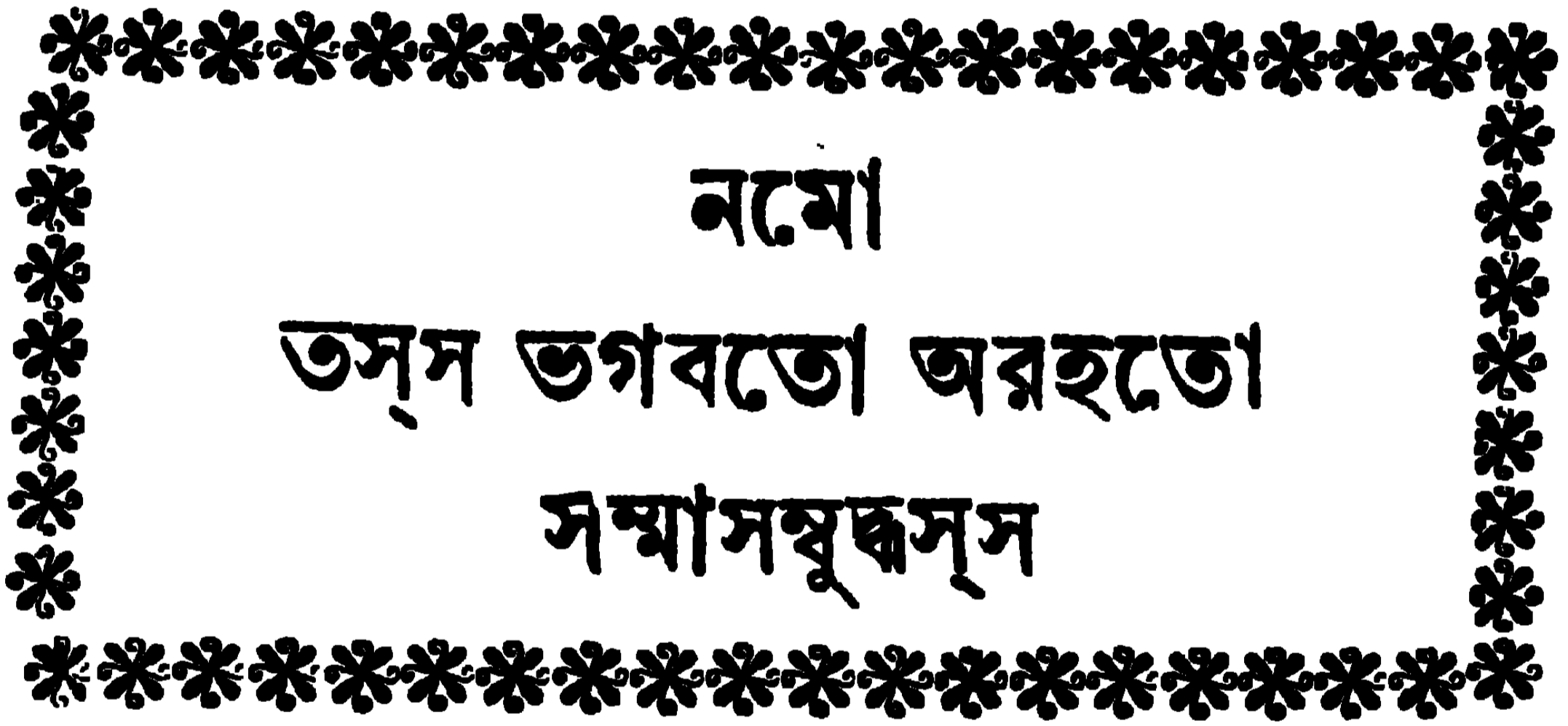
মূল্য দুই টাকা ম

কলিকাতা,
১৬নং শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এ কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—

- ১। গুপ্ত ব্রাদার্স—
১৬ নং শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট
- ২। চক্রবর্তী, চাটার্জি কোম্পানী লিমিটেড—
১নং কলেজস্কোয়ার
- ৩। বুক কোম্পানী—
কলেজস্কোয়ার
- ৪। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস—
২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
- ৫। সরস্বতী লাইব্রেরী—
৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
মেট্‌কাক্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



নমো

তস্ম ভগবতো অরহতো

সম্মাসম্বুদ্ধস্ম

যিনি শুভ
যিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া
ইহকাল ও পরকালের
আনন্দলীলা
প্রত্যক্ষ করিতেছেন
মহাসাধকের সাধনারসনিঃসৃত
প্রাচীন ভারতের
এই গৌরবগয় ইতিবৃত্ত
আমার সেই
পূজনীয় আচার্য্য
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত
মহাশয়ের চরণকমলে
উৎসর্গ করিলাম

কেশবনিকেতন, কলিকাতা
ব্রথহিতীয়া—৩০এ আবাড়,

১৯৩০

ভক্তি-প্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

নিবেদন

বৌদ্ধ-ভারত গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। দেশের ও বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী স্মৃতিগণের গ্রন্থাবলী ও রচনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের সহিত এক স্থলে এই গ্রন্থের পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই গ্রন্থখানি রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। মহাপুরুষ বুদ্ধের সাধনা এই দেশে কি প্রকারে এক বিরাট্ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সাধনার মূলে সত্যরত্ন নিহিত থাকে সেই সাধনা কিছু-না-কিছুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই ইহা জ্ঞাত আছেন, মোহম্মদ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সাধনা ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র কিংবা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইয়ুরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের আলোকে বাহারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করেন তাহারা ঐ যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পান না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত যে অস্পষ্টতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐ যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনা-রাজির অভ্যন্তরে ঐক্যের একটি চিরন্তন ধারা কল্পের অস্তঃসলিলা ধারার মত নিঃসন্দেহ প্রবাহিত হইতেছে। ভারত-ইতিহাসের এই ঐক্যধারা সম্ভবতঃ যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষদের সাধনার অমৃত-

ধারা। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, ব্যাস-বাল্মীকি, বুদ্ধ-শঙ্কর
মহাজনদের সাধনার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের ঐক্যসূত্রের
করিতে হইবে।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ বুদ্ধ হে
লাভ করেন উহার আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চারিদিকে
হইলেন তাঁহাদিগকে লইয়া সজ্জের সৃষ্টি হইল। এই
সাধুরাই মহাপুরুষের বাণী প্রচার করিতেন। সজ্জের প্রভাব
দেশের উপর পতিত হইয়াছিল। সজ্জ যখন বৃহৎ হইয়া দেশের
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল তখন হইতে সজ্জের সাধু
আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্য দেশবাসীর সমালোচনার
হইল। দেশবাসীদের অভিপ্রায় সজ্জবাসীদের আচার-ব্যব
নয়মিত করিতেছিল। এইরূপে বৌদ্ধসজ্জ এক বিরাট জনস
পরিণত হইল।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ নগরের বাহিরে প্রকৃতির সুরম্য নিকেত
নিভূতে বিহারে বাস করিতেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের এই বিহারগুলি
সেকালে ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। সাধু
শিষ্যদিগকে কেবল ধর্ম নহে, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, চিত্রকলা
ভাস্কর্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরা ও অপরা বিজ্ঞা শিক্ষা প্রদ
করিতেন। এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধের সাধনা হইতে প্রাচীন ভারত
যে আশ্চর্য্য সত্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই যথ
সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন নদীতে বান আ
তখন খাল, বিল, নালা সমস্তই জলে পূর্ণ হইয়া যায় ; বৌদ্ধধর্মের

অমৃতরসও সেইরূপ বানের মত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্লাবন ভারতবর্ষ ছাপাইয়া দেশান্তরেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমনই এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে এই দেশে আমরা এমন এক ভূপতি দেখিলাম যাঁহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্যবলে তিনি এমন সংস্কারশূন্য হইয়াছিলেন যে, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলকে তিনি তুল্যরূপে ভালবাসিতেন। প্রজাদিগকে তিনি পুত্রবৎ পালন করিতেন। সাধারণ রাজার মত তিনি রাজস্ব আদায় এবং রাজ্যশাসন করিয়া স্বীয় কর্তব্য শেষ করেন নাই। রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ যে যুগটিকে বৌদ্ধযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এই গ্রন্থে সেই যুগের বহু পূর্বের এবং পরবর্ত্তী কালের কোনো কোনো কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার কারণ পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৌদ্ধ-ভারত বৌদ্ধযুগের নহে, বৌদ্ধ সত্যতার ইতিহাস। নানা দিক হইতে এই ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইতে পারে। সেই রূপ আলোচনার অধিকার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরই আছে। আলোচ্য গ্রন্থে সমস্ত বিষয়ই ষতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচনার জটিলতা পরিহার করিয়া পুস্তকখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি যে সকল গ্রন্থকার ও প্রবন্ধলেখকের
 রচনা হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাদিগকে আমার
 অশুরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত স্কুমার দত্ত মহাশয়
 অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তাঁহার লিখিত 'তক্ষশিলা' সম্বন্ধে
 একটি প্রবন্ধের হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ হইতে
 আমি কয়েকটি তথ্য সঙ্কলন করিয়াছি। প্রবন্ধলেখককে
 আমি এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ
 সুহৃদ্ শ্রমণ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয় আমার গ্রন্থের
 অধিকাংশ শ্রবণ করিয়া আমাকে কোনো কোনো স্থান
 সংশোধনের সদুপদেশ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

কেশবনিকেতন, কলিকাতা }
 আষাঢ়, ১৩৩০ }

বিনীত
 গ্রন্থকার

গ্রন্থ-সঙ্কলনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির

সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :—

- (১) Civilisation in Ancient
India, Vols. I & II ... R. C. Dutt.
- (২) Vinaya Texts ... Sacred Books of the East.
- (৩) Sutra Pitaka ... Sacred Books of the East.
- (৪) ধর্মপদ ... শ্রীচাক্রবর্ত্ত বসু
- (৫) Buddhist India ... T. W. R. Davids.
- (৬) Buddhism ... T. W. R. Davids
- (৭) Early History of India Vincent Smith.
- (৮) Indian Sculpture and
Painting ... E. B. Havell.
- (৯) The Ancient & Mediaeval
Architecture of India E. B. Havell.
- (১০) অজস্রা শ্রীঅসিতকুমার হালদার
- (১১) A Guide to Taxila ... Published by the Govern-
ment of India.
- (১২) বিশ্বকোষ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞা-
মহার্ণব
- (১৩) প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ
- (১৪) নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ
- (১৫) জাতক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ
- (১৬) Kautilya's Arthasastra R. Shamasastri.
- (১৭) Hinduism and Bud-
dhism Sir Charles Eliot.

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়—বুদ্ধ ও বৌদ্ধশাস্ত্র	১—১২
দ্বিতীয় অধ্যায়—বুদ্ধ ও সম্বৎ	১৩—২৮
তৃতীয় অধ্যায়—বৌদ্ধনিধি ও সম্বৎ প্রকৃতি	২৯—৩৬
চতুর্থ অধ্যায়—বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ	৩৭—৩৯
পঞ্চম অধ্যায়—বৌদ্ধধর্মের উদ্ভাবন ও বিস্তার	৪০—৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়—বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮—৮৪
সপ্তম অধ্যায়—জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ	৮৫—৯৬
অষ্টম অধ্যায়—বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক	৯৭—১১১
নবম অধ্যায়—আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা	১১২—১২৮
দশম অধ্যায়—বৌদ্ধ-শিল্প	১২৯—১৬৬
একাদশ অধ্যায়—বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি	১৬৭—১৮৩



ध्यानो बुद्ध

বৌদ্ধ-ভারত

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শাস্ত্র

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের হিন্দু আৰ্য্যগণ যে ক্রিয়াকর্ম, আচারঅনুষ্ঠান নির্বিচারে মানিয়া আসিতেছিলেন, কালক্রমে সেই সকল অনুষ্ঠান এমন প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেগুলি আর কাহারও চিন্তে ধর্মবোধের সঞ্চার করিত না। অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভার বিহ্বল হইয়া ঋষেদের ঋষিগণ স্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে সরল বন্দনামন্ত্রে ইস্র, বরুণ, উষা প্রভৃতি যে দেবতাগণের আরাধনা করিয়াছেন, তখনও সেই দেবতাগণের নাম উচ্চারিত হইত বটে, কিন্তু সেই নাম তখন কাহারও হৃদয়যন্ত্রে ভক্তিতারে ঝঙ্কার দিত না। এই সকল ঋষির বংশধরগণই বাহির হইতে চাপ পাইয়া নানা প্রয়োজনের তাগিদে আপনাদের কর্ম বিভাগ করিয়া নানা বর্ণের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। কালে কালে সেই ভাগবিভাগ জাতি-

ভেদের সৃষ্টি করিল। ঋষিদের বংশধরগণের এক দল হইলেন ব্রাহ্মণ; ক্রিয়াকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণাই তাঁহাদের ব্যবসায় হইল। ইহাতে কোনও সুফল ফলে নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথায় লোকের মনে এই বোধ জন্মিল যে, যাজক পুরোহিতই তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া ভগবানকে ডাকিবেন, ব্যক্তিগত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাদের ধ্যানধারণার কোনও প্রয়োজন নাই। বেদের ঋষি যে ভাবের প্রেরণায় মন্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের বন্দনা গান গাহিয়াছেন, সে ভাব সর্বতোভাবে অন্তর্হিত হইল। মন্ত্রের আবৃত্তি, আয়োজনের অনাবশ্যক আড়ম্বর, ক্রিয়ার বাহুল্য এবং অনুষ্ঠানের প্রকরণ ভাবের অভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবের বিলোপের অনুপাতে কর্ম্মকাণ্ড বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয় তাহা মানিতে চাহিবে কেন? মানুষের চিন্ত আপনাপনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। সত্য বটে, উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানা দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিতেরা দুর্বেদ্য বাদানুবাদের দ্বারা নানা ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উচ্চ ধর্ম্ম, সেই উচ্চ তত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। সাধারণ লোক তাহার খোঁজ রাখিত না, অথবা উহা ধারণা করা তাহাদের সাধ্যের অতীত ছিল। ফলে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্মের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও অর্থ তাহারা কিছুমাত্র বুঝিত না সেই সমস্তই তাহারা আচরণ করিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া মানুষ যাহা করে

না, সে তাহাতে সুখ পায় না এবং তাহার মন সেই অনাবশ্যক বোঝা ছুড়িয়া ফেলিবার জন্যই বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

সেই সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে মানবচিত্ত একদা এমনই বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধকশ্রেষ্ঠ গৌতম বুদ্ধ এই বিদ্রোহীদের অন্যতম। লোকে তাঁহাকে বেদবিরোধী বলিয়া নাস্তিক আখ্যা দিল, তিনি সেই নিন্দার মুকুট পরিয়াই বিদ্রোহের পতাকা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। তিনি উচ্চ তত্ত্ব ছাড়িয়া সোজা কথায় সত্য প্রচার করিয়া লোকের মন জয় করিয়া লইলেন। ছোটবড় সকলকে স্নেহকণ্ঠে নিজের কাছে ডাকিয়া ধর্মের উদার ক্ষেত্র দেখাইয়াছিলেন। তিনি তত্ত্বও বলেন নাই, শাস্ত্রও বলেন নাই; বলিয়াছেন তাঁহার অন্তরের উপলব্ধ সহজ সত্য। তাহা অনাবৃত, অবিকৃত সত্য বলিয়াই সর্বজনের গ্রহণযোগ্য। এই জন্য তাঁহার ধর্ম কতিপয় পণ্ডিতের ধর্ম হইল না; সকল দেশের, সকল মানবের ধর্ম হইল। ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমৃত উৎসের রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল।

এই প্রাণের ক্রিয়া সকল দিক দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম নহে—শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সকল দিকেই দেশ উন্নত হইয়াছিল। গৌতমবুদ্ধ ইচ্ছাপূর্বক স্বয়ং একটি নূতন ধর্মস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এমন কথা যদি কেহ মনে করেন তিনি নিঃসন্দেহ ভুল করিবেন। তাঁহার অপূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি এদেশের সকল শাস্ত্র, পুথানুপুথ আলোচনা করিয়াছেন, গুরুদের শরণাপন্ন হইয়া নানা

সাধনার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, শ্রেয়ের সন্ধানে দেশে দেশে, বনে, পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেকে এইরূপ পরিব্রাজকরূপে ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বুদ্ধের মতানুবর্তীদের “শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ” নাম দিয়া শাস্ত্রমধ্যে এক পার্শ্বে একটু ঠাঁই দিয়াছেন। ইহা হইতেই এ কথা বোঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতেও গোঁতমবুদ্ধ এমন কিছু অশ্রায় করেন নাই যে, তাঁহাকে একান্ত উপেক্ষনীয় বলিয়া তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন। হয়তো শাস্ত্রকারগণের মতে বুদ্ধ নূতন কিছু করেন নাই। এক হিসাবে এ কথা মানিয়া লওয়া যায়। যেহেতু সহজ সত্য চিরকালই এক, কিন্তু সেই সহজ সত্যই মানুষ বারংবার ভুলিয়া যায়। বুদ্ধ সেই বিস্মৃত সত্য সরল হৃদয়স্পর্শী কথায় বলিয়াছেন। পুঞ্জীভূত ক্রিয়াকর্মের আবর্জনা উড়াইয়া দিয়া লোককে সত্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি সমাজে, শাস্ত্রে, আচারে, অনুষ্ঠানে কোথাও সত্যের দেখা না পাইয়া পাগল হইয়া সত্যরত্ন উদ্ধারের জন্য সুখভোগ, রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সত্যধন লাভ করিয়াই বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

অনুগামী শিষ্যদের কাছে তিনি তাঁহার সত্যসাধনার এই কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, বহুজনের হিতকামনায় তিনি তাঁহার উপলব্ধ সত্য সোজা কথায় সর্বজন সমক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ-লোক সাধারণকে চক্ষুস্মান করিল, অমৃত দুন্দুভি শ্রবণ করাইল।

যাহা কোনকালে শুনে নাই লোক সাধারণ এমন মধুর ধর্মবাণী শুনিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিল। তাঁহার সেই সত্যবাণী মন্ত্র হইয়াছে, তাঁহার সেই কাহিনীই উত্তরকালে শাস্ত্র হইয়াছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকার গৌতম বুদ্ধের জন্ম যত ক্ষুদ্র আসনটিই রাখুন না কেন, পৃথিবীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি এমন বৃহৎ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে প্রীতিপূর্বক আপনার বলিয়া চিনিয়া জানিয়া লইয়াছে। পুরাণে তিনি অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এমন অবতার হইয়া তাঁহার গৌরব একটুও বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবতার বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে অন্তরে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে হৃদয়আসনে বসাইয়া ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্যদান করিবেন।

বুদ্ধকে ঘরের কোণে ছোট একটি আসন দিয়া হিন্দুরা তাঁহার ধর্ম ও শাস্ত্র এই দেশ হইতে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম একরূপ এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

কিন্তু সজীব পাদপ যে দিকে আলোক পায় সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। জন্মভূমিতে ঠাই না পাইয়া এই ধর্ম বিদেশকেই আশ্রয় করিল এবং তথায় বলিষ্ঠ, স্বাধীন, প্রাণবান্ নরনারীর শ্রদ্ধার আলোকে অপূর্ব বিকাশ লাভ করিল। বুদ্ধের ধর্ম যদি অগতীর হইত, তাঁহার সাধনাতরু যদি ভারতবর্ষের মর্মস্থানে শিকড় প্রবেশ করাইতে না পারিত, তাহা হইলে যখন এদেশ বিদ্রোহী হইয়া এই তরুর শাখা পল্লব কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তখন

মূলটিও উপাড়িয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা হয় নাই এমন নহে কিন্তু মন্দির ভাঙ্গিয়া শাস্ত্র পোড়াইয়া ত এই চেষ্টা সফল হইতে পারে না; এই পত্রপল্লবশাখাহীন তরুর মূলটা এদেশের মাটিতে রহিয়াই গিয়াছে।

গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথমে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, একথা সত্য নহে। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে হইতেই বিরুদ্ধতা দেখা গিয়াছে। নিগ্রন্থ, আজীবক প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করে না।

এই বেদবিরোধী ক্ষুদ্র বৃহৎ দলগুলির প্রভাব সমস্ত দেশের উপর পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, তথাপি দেশের স্থানে স্থানে লোকের চিন্তা বিদ্রোহের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র দলের নায়কগণ সকলের গ্রহণযোগ্য কোন উন্মুক্ত সার্বভৌম রাস্তা নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন নাই। দুই একজন নায়ক একদল লোকের চিন্তা জয় করিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, এইমাত্র। গৌতম বুদ্ধের অত্যাশ্চর্য প্রতিভার আলোক মানবের গম্ভব্য পথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার সাধু চরিত্র এমন মাধুর্যে মণ্ডিত ছিল যে, তাঁহাকে সকলেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল, তাঁহার উদারতা এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে কোনো লোকই তাঁহাকে আপনার বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না। তাঁহার বাণী এমন ঋজু ও মর্ম্মস্পর্শী ছিল যে, তীক্ষ্ণ তীরের ফলার স্থায় উহা যে কোনো শ্রোতারই হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকিত।

এখন প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও এই মহাপুরুষের নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ চরিত্রের পবিত্র-সৌরভ এবং নীতি ও ধর্মের বাণী অসংখ্য নরনারীর চিত্তহরণ করিতেছে। তাঁহারই অপূর্ব মৈত্রী-মূলক ধর্ম ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা ভাষাভাষীদিগকে এক-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনের শত বৎসর এই সদ্বর্ষ কখনো উজ্জ্বল প্রভায়, কখনো মৃদুমন্দ ভাতিতে ভারতবাসীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। তাহার-পর সহসা রূপকথার রাজকুমারীর প্রাণের মত কে যেন কেমন করিয়া সোনা রূপার কাঠি ফিরাইয়া বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধবিহার এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অল্পকাল মধ্যে সমস্তই প্রাণহীন করিয়া দিল। গভীর অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা পড়িয়া গেল।

পতন দশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত অঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বৌদ্ধধর্মের পৈতৃক ভিটায় স্থান হইল না। স্বর্গহের পরিত্যক্ত অনাদৃত যুবকের গ্যায় বৌদ্ধধর্মকে বিদেশেই ঘর বাঁধিতে হইয়াছে। সেইখানে এই ধর্ম সবিক্রমে সর্গোরবে আপন মহিমায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই ধর্মের গোরব বিস্মৃত হইল।

যাঁহারা এই মৈত্রীমূলক সদ্বর্ষের বর্তমান অভ্যুত্থানের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে, ধৈর্যশীল প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিতর হইতে এই ধর্মের কোনো গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারেন নাই; ভারতপ্রান্তবর্তী নেপাল এবং ভারতের বাহিরে তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র

সংগৃহীত হইয়াছে। নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানে মহাবান বৌদ্ধধর্ম এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। একই ধর্ম, একই শাস্ত্র দুই সম্প্রদায়ে দুইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হীনযান ধর্মগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের আদিম অবিকৃত চেহারাটি দেখা যাইতে পারে। এই ধর্মশাস্ত্র “ত্রিপিটক” নামে খ্যাত। আমরা সিংহল হইতে এই “ত্রিপিটক” পাইয়াছি। বর্তমানে সিংহলে যে ত্রিপিটক প্রচলিত আছে তাহার পাঠ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির নির্দ্ধারিত পাঠের সহিত অভিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ যখন অশোকপুত্র মহেন্দ্র একদল বৌদ্ধ সাধুসহ পিতার আদেশে সিংহলে ধর্ম প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, সেই সময়ে সিংহল রাজ তিস্‌স বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সিংহলে এই ধর্ম স্থাপন করেন। যে সকল বৌদ্ধসাধু মহেন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ হয়ত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে বোগদান করিয়া থাকিবেন। ইহার দেড়শত বৎসর পরেই পালি পিটকগুলি হস্তাক্ষরে গ্রন্থাকারে লিখিত হয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সময়েই এই ধর্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল এবং তখন সাধুদের স্মৃতিতেই এই ধর্ম যথাযথ ভাবে মুদ্রিত ছিল, সুতরাং সিংহলী ত্রিপিটককে অসঙ্কোচে পণ্ডিতেরা প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই ত্রিপিটকেই বুদ্ধের বাণী অবিকৃত আকারে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের দুই এক শত বৎসর মধ্যে ত্রিপিটক গ্রথিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার জীবন ও বাণী যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ

অতিরঞ্জিত মনে করিবার কারণ নাই। অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক হইয়াও বুদ্ধ দেশপ্রচলিত ভাষাতেই ছোটবড়, পণ্ডিতমুর্খ সকলের নিকট তাঁহার ধর্মকাহিনী বিবৃত করিতেন, সুতরাং প্রাকৃত পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি যথাযথ ভাবেই লিখিত হইয়া থাকিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

বুদ্ধের জীবিতকালের ও তাঁহার আবির্ভাবের অব্যবহিত পরবর্তী বহুশত বৎসরের ইতিহাসের বিস্তর উপকরণ এই ত্রিপিটকে পাওয়া যায় বলিয়া ত্রিপিটকের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ষাঁহারা বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের আদিম অবিকৃত মূর্তি দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ কেহ মহাযান বৌদ্ধধর্মকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা হীন বলিতে চাহেন। তাঁহাদের সহিত সকলে একমত হইতে পারিবেন এমন আশা করা যায় না।

মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের একটি আশ্চর্য পরিণতি দেখা যায়। মহাযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মুখের কথাগুলি যথাযথ আকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের সাধকগণ সাধনার অমৃতরস সেচনে সেই মূলবীজগুলিকে পত্রিত, পুষ্পিত বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। সেই পরিণতির ইতিবৃত্তের মধ্যে সামাজিক রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের উপকরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে সাধনার ক্রমবিকাশ উজ্জ্বল আকারে প্রস্ফূর্ত হইয়াছে। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের সাধনার ইতিবৃত্ত যেমন সুপরিষ্কৃত হইয়াছে, তেমন সুস্পষ্ট বর্ণনা অগ্ৰত্র দেখা যায় না।

মহাযান সম্প্রদায় আদিম বুদ্ধবাণীকে মূলধন করিয়া নানাধিক দিয়া খাটাইয়া, বাড়াইয়া প্রাণেরই পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে হয় তো স্থানে স্থানে লোকসান হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে ক্ষতি এড়াইবার উপায় নাই। কারণ ঘরের পুঁজি লইয়া ব্যবসায়ে নামিলে লাভ লোকসানের ঝুঁকি থাকিবেই। সুতরাং মহাযানদের শাস্ত্রে অতিরঞ্জন দেখিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। তাহাদিগের সমাজে, সাধনায় ও শাস্ত্রে মৃত্যুর দুর্লক্ষণ নাই, নানাধিকে জীবনের আবেগই দৃষ্ট হইয়া থাকে; প্রাণের আনন্দলীলা নিরন্তর হিল্লোলিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত অতীব কোতূহলাবহ।

কেবল মাত্র ধর্মসাধনার দিক হইতে নহে, ঐতিহাসিকতার দিক হইতেও বৌদ্ধশাস্ত্রের অলোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র দৃষ্ট হয়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বাহ্য আকার, রাষ্ট্রীয় বিভাগ, সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রে নানাস্থানে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের আকর হইতে প্রতিদিন পণ্ডিতেরা নিত্য নূতন রত্ন আহরণ করিতেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র বা ত্রিপিটক মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম। বিনয় পিটকে সজ্জের ইতিবৃত্ত বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বিনয়ের পাঁচ ভাগ আছে; পারাজিক, পাচিস্তীয়, মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, পরিবার।

বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্বপেক্ষা শক্তিশালী জনসঙ্ঘ। বিনয়পিটকে এই সঙ্ঘের অভ্যুত্থান ও নানা পরিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। পাতিমোক্খ সূত্রবিভঙ্গের অন্তর্গত। এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বলা হয়। পাতিমোক্খ গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তের বিধানগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত আছে। সূত্রবিভঙ্গে নানা অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পূর্ণিমা ও অমাবস্তা তিথিতে বৌদ্ধদের সম্মিলনীতে সূত্রবিভঙ্গ পঠিত হইত। বৌদ্ধ সাধুদের এই পার্ব্বিক সভাগুলির একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের কৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপগুলি অকপটে স্বীকার করিতেন এবং পাপগুলির নিমিত্ত কোনো-না-কোনো প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সভার প্রয়োজনের নিমিত্ত পাতিমোক্খের প্রায়শ্চিত্তবিধি সূত্রাকারে বিরচিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং এই সূত্রগুলির আবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পালি বৌদ্ধশাস্ত্র এক মাত্র ভাবে নহে, ভাষায়ও ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ ভগবান্ বুদ্ধ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাঁহার স্ফুটস্থিত ধর্মমত জনসমাজে প্রচারের জন্ত বাহির হইলেন তখন তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার পরে তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও বেশী কাল জীবিত ছিলেন।

এই দীর্ঘকালে তাঁহার মুখের বাণী শিষ্যগণ যথাযথ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। এইসকলই সূত্রপিটকে কোথায়ও ছাঁটা-কাটা ধর্মমত লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোন্ সময়ে, কোথায়, কি কারণে, কাহার নিকট বুদ্ধ তাঁহার ধর্মবাণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন প্রত্যেক সূত্রেরই ভূমিকাভাগে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। সূত্রপিটকের প্রায় সকল সূত্রেরই বক্তা স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ। কদাচিৎ তাঁহার প্রধান শিষ্যদের দুই এক জনের নাম দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের এই ঐতিহাসিক যথাতথ্য সকল দেশের সুধীবর্গকে এই শাস্ত্রালোচনায় আকর্ষণ করিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ভারতের সভ্যতা ও ভারতের মহাপুরুষ বুদ্ধ পৃথিবীতে এমন অপূর্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেও অস্বাভাবিক অতিরঞ্জন ও বাহুল্য স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ এই গ্রন্থগুলি সহিসু বৌদ্ধদের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা কাল ও সমাজ অতিক্রম করিয়া বর্তমান যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শাস্ত্রের বাক্যবিগ্ণাসে ও রচনাভঙ্গীতে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বিচিত্র ধর্মমতের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। তথাপি এই শাস্ত্রের নিজস্ব মহিমাময়রূপ ঢাকা পড়িয়া যায় নাই। যুক্তি ও বিজ্ঞান-বাদীদিগের জ্ঞানদৃষ্টি উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে ও তাঁহারা এই ধর্মের ও শাস্ত্রের আদর না করিয়া পারিবেন না।



বুদ্ধ অমিতাভ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধ ও সংঘ

বুদ্ধ-শিষ্যের তিনটি আশ্রয় । বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ । সাধন-জীবনের আরম্ভেই তিনি প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মত্তপান, অপরাহু ভোজন, নৃত্যগীত, মাল্যধারণ, গন্ধদ্রব্যলেপন, কোমল-শয়ন, এবং স্বর্ণরৌপ্য-প্রতিগ্রহ—এই দশটি? বর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই দশটি “শীল” তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন । দুঃখমোচনের নিমিত্ত বুদ্ধ-শিষ্য এই যে সাধনা গ্রহণ করেন, ইহা গভীর সংঘমের সাধনা ।

লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ স্বয়ং এই দুঃখমুক্তির সাধনা আপন জীবনে আচরণ করিয়াছিলেন । তিনি সিদ্ধিলাভের পরে দীর্ঘকাল তাঁহার এই সদ্বর্ষের অমৃতবাণী লোকসমাজে প্রচার করিয়া আপন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন । শিষ্যদিগকে তিনি পদে পদে সংঘমের সূত্রে বাঁধিতেন, তথাপি দলে দলে লোক তাঁহার শরণ লইয়াছিল কেন ? বুদ্ধ তাঁহার জীবনে কি লাভ করিয়াছিলেন ? এবং তাঁহার পুণ্যপ্রভাব যে মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মণ্ডলী কোন্ লাভের আশায় সাংসারিক ভোগ-মুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিল ?

মানব জীবনে দুঃখ আছে তাহা একান্ত সত্য ; এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য গভীর সংঘমের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহাও

সত্য । এই অপরিহার্য দুঃখ দূর করিবার জন্ম মহাপুরুষ যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কি কেবল বাসনা-বিলোপের সাধনা ? বোধি লাভ করিয়া তিনি অমৃতমণ্ড পান করিয়াছিলেন । এই নির্বাণ বা অমৃতলাভের নিমিত্তই তিনি দুঃখের মূলোদ্ভূত কারণ এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । তিনি জানিয়াছিলেন,—

“জিঘৃচ্ছা পরমা রোগা সজ্জারা পরমা দুঃখা” গৃধ্ৰুতা পরম রোগ এবং রূপবেদনা-সংজ্ঞা সংস্কার-বিজ্ঞান এই প্রত্যয়জ পদার্থগুলি পরম দুঃখ । দুঃখের তথ্যটি যখন বোধগম্য হয়, তখনই দুঃখের উপশম হয় । ধম্মপদে উক্ত আছে “এতং এগাত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং” এই তত্ত্ব বুঝিয়াই পাণ্ডিতেরা পরম সুখ লাভ করেন । ধম্মপদ বলেন,—

আরোগ্য পরম লাভা সন্তুট্টী পরমং ধনং

বিস্‌সাসা পরমা এগাতী নিব্বানং পরমং সুখং

“আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ ।”

বুদ্ধ আপনার জীবনে এই পরম সুখ লাভ করিয়াছিলেন । দুঃখোপশমে তিনি এমন সদাপ্রসন্ন, সৌম্যকান্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া দর্শকমাত্রের হৃদয়ই শ্রদ্ধায় অবনত হইত । ঋষিপুত্রে আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার পঞ্চশিষ্য পণ করিয়াছিলেন, গোতমকে কিছুতেই গুরু বলিয়া স্বীকার বা সম্মান করিবেন না ; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন

না। তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মস্তক আপনা-আপনিই অবনত হইয়াছিল। বুদ্ধের লাভের পূর্বে গৌতম যখন একটি মহাভাবের প্রবল প্রেরণায় অন্তহীন উন্মুক্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রবল সত্যনিষ্ঠা এই পঞ্চ শিষ্যকে আকর্ষণ করিয়াছিল। নৈরঞ্জনা-তীরে উরুবিল্ব বনে তপশ্চর্য্যার সময়ে তাঁহারা গৌতমের সেবা করিয়াছেন। অতঃপর যখন কৃচ্ছ সাধনা ত্যাগ করিয়া তিনি নিয়মিত পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্যেরা তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপত্নে গমন করেন।

শিষ্যেরা বিমুখ হইয়া গুরুকে ছাড়িয়াছিলেন বটে, গুরু কিন্তু অমৃতমণ্ড পান করিয়া তাহা একাকী গোপনে সম্ভোগ করিতে পারিলেন না,—ক্ষুধার্ত শিষ্যদের সন্ধানে ঋষি-পত্নে আসিলেন। অনন্যসুলভ মহিমায় মগ্নিত হইয়া তিনি অমৃত পরিবেশনের নিমিত্ত শিষ্যদের সম্মুখে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের মনের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা শূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহারা বুদ্ধকে ও ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সত্যের পতাকা হস্তে এই যে পঞ্চ বীর সর্বপ্রথমে বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাদের নাম কোণ্ডাঞ্‌ঞ (কৌণ্ডিণ্য), ভদ্রীয় (ভদ্রীয়), বাপ্পা (বাপ্প), মহানা ও অশ্বজি (অশ্বজিৎ)।

এই পাঁচটি সত্যানুরাগী সাধককে লইয়া বুদ্ধের আশ্রয়ে আপনা-আপনি যে মণ্ডলীর সূত্রপাত হইল, সেই মণ্ডলীটি একটু বাড়িয়া উঠিয়াই “সংঘ” নাম ধারণ করিল। কোন্ সূত্র

অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া এই দলটি মূর্তি পরিগ্রহ করিল ? মহাপুরুষের অন্তর্নিহিত অপার প্রেমই নিঃসন্দেহ এই মিলনের সূত্র। এই প্রেমিক মহাত্মার মধুর ব্যবহারে, মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়াই, অনুগত শিষ্যেরা পরম সুখ নির্ব্বাণলাভের সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংঘের উদ্ভবকালে বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁহাকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রেমবান্ ও মহাপ্রাণ শিক্ষক ;—শুদ্ধ শাস্ত্র কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহেন। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাণী কি, ব্যবহার কি, মানুষের সহিত এবং সমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি, লোকশিক্ষক বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের মূর্তিমান সমাধান ছিলেন।

নির্ব্বাণের সুখ কি গভীর, কেমন পরিপূর্ণ—তাঁহা বুদ্ধের জীবনে একান্ত সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেশদেশান্তরের সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের যে অসীম করুণা ছিল, সেই করুণাই তাঁহাকে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। “সকলের দুঃখ দূর হউক, সকলে সুখী হউক” ইহাই তাঁহার সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানানলে তিনি অবিচা ভস্মীভূত করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এমন নহে ; “জগতের সকল জীব সুখী হউক” এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা তাঁহার অন্তর-বাহির নিঃসন্দেহ প্রেমের পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সাধন-সংগ্রামে এই মৈত্রীবলেই তিনি জয় লাভ করিয়া অমৃত-লাভ করিয়াছিলেন।

“অমৃত দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে ; বাহাদের কাণ কাছে, তাহারা শোন । শ্রদ্ধাধারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে ।”* এই বাণী ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী বলিয়াই মনে হয় । ধর্মের যে মূলতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিজের নূতন সৃষ্টি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই । তাঁহার নিজের কথায়ই মনে হয়, তিনি যেন হারানো ধন খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন । সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকায়ে তিনি বলিয়াছেন,—

“পার্বত্যপথে চলিবার সময়ে কোন ব্যক্তি প্রাচীনকালের একটি পথ দেখিতে পাইলেন । সেই পথে প্রাচীনকালে কত লোক যাতায়াত করিত । সেই পথে চলিতে চলিতে তিনি সেকালের একটি পুরী দেখিলেন । মনোহর সে পুরী, তথাকার প্রাসাদ উদ্যান, কুঞ্জ, সরোবর ও প্রাচীরে বেষ্টিত ; রমণীয় সেই স্থান । তিনি এখন কি করিবেন ? ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে কিংবা রাজমন্ত্রীকে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন এবং সেই প্রাচীন পুরী নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে অনুরোধ করিবেন । তাহা হইলে সেই নবাবিকৃত প্রাচীন নগর আবার ধনে, জনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে । ভিক্ষুগণ ! আমিও সেইরূপ একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি । পুরাকালের মহাজ্ঞানীরা এই

* অপারুতা তেসং অমতস্‌স দ্বারা

যে সোতবস্তো পমুঞ্চন্ত সঙ্কং,

বিহিংসসঞ্ঞী পণ্ডণং ন ভাসিং,

ধম্মং পণীতং মনুজেহু ব্রহ্মে । (মহাবগ্‌গ)

পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ভিক্ষুদের ও শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।”

এইখানে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল—বুদ্ধ যে ধর্মতথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তব্দের দিক দিয়া তাহার মধ্যে তিনি কোনো মৌলিকতারই দাবী করিতে চাহেন না। প্রাচীন সুরায় নূতন পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি ধর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রাচীন ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মহাপুরুষ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই তাহাদের দার্শনিক নানা মত স্ক্রকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। তব্দের দিক দিয়া বুদ্ধ তাহাদেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর ধর্ম চক্র-প্রবর্তন সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন—“Never in the history of the world had a scheme of salvation been put forth so simple in its nature, so free from any super-human agency,”—“পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত বর্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই।”

পিটক অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এই মুক্তি বা নির্বাণকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (১) নির্বাণ,—শূন্য, বিনাশ, মহাবিনাশ, অহং বোধের বিলোপ-সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন। (২) নির্বাণ এক পরম রহস্য—স্বয়ং বুদ্ধ

ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নাই। (৩) নির্বাণ মানব জীবনের গৌরবময়, সুখকর ও কল্যাণকর পরিণাম। এই সকল বিভিন্ন মতের কোন সমাধান আছে কিনা, তাহার আলোচনা করিবার অধিকার বিশেষজ্ঞ সুধীবর্গেরই আছে সুতরাং সেই আলোচনার দিকে আমরা যাইব না।

সাধারণ বুদ্ধিতেই ইহা মনে হয় যে, বিশেষ একটি আকর্ষণ-ভিন্ন মানুষ কোনোখানে দল বাঁধিতে চায় না। মহাপুরুষ বুদ্ধ যখন তাঁহার নবলঙ্ক সত্যপ্রচারের জন্য লোকসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার চারিদিকে ধীরে ধীরে দল জমিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার বাণী মানুষকে নিঃসন্দেহ অতুল আনন্দ দান করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নাম করেন নাই, আত্মা-পরমাত্মার জটিল তত্ত্বকে তিনি একেবারে আমলই দিলেন না, অতি-প্রাকৃত কোনো-বিচুর কথা कहিলেন না; অথচ ছোটবড়, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁহার ধর্ম ও সংঘ আগ্রহসহকারে স্বীকার করিল।

সংঘের আদিম শিষ্যেরা তাঁহার কাছে কি পাইলেন? যাহা পাইলেন তাহা আর যাহাই হউক “শূন্য” নহে, “না” নহে। তাহা আশা ও আনন্দ, তাহা অভয় ও অশোক। শিষ্যেরা যাহা পাইলেন তাহা অনির্বচনীয়; এবং তাহা এমন যাহার জন্য তাঁহারা অনায়াসে সাংসারিক সুখভোগ বর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ঋষিরা যাহাকে বাক্যের মনের

অগোচর বলিয়াছেন, সেই পরম সত্য মহাপুরুষ বুদ্ধের স্তব্ধ-শাস্ত্র উপলব্ধির গোচর হইয়াছিল। এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন, “অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে” এবং পৃথিবীর নরনারী এই অমৃতের জন্যই তাঁহার ধর্ম বরণ করিয়াছে।

মহাপুরুষেরা মানবজাতির হৃদয়-সরোবরের প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল। তাঁহারা অগ্নি জ্যোতিঃতে মানবহৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন। মানুষের মনো-ভ্রমর গন্ধ, বর্ণ, মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া এই কমলই আশ্রয় করিয়া থাকে। মহাপুরুষ বুদ্ধ সকল মানবের এমনই আশ্রয়স্থল ছিলেন। সিংহলী কবি মেধাকর তাঁহার “জিনচরিত” গ্রন্থে এই মহাপুরুষকে “নির্বানমধুদং” বলিয়াই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

এই নির্বানমধুলাভ করিবার জন্য ভিক্ষুকে সকল জীবের সুখ ও কল্যাণ ভাবনা করিতে হইবে। তাঁহাকে বুদ্ধের অনুশাসন প্রসন্ন মনে মানিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ জীবন যাপন করিতে করিতে যখন তাঁহার বাসনার উপশম হইবে তখন তিনি সুখকর শাস্ত্রত নির্বান প্রাপ্ত হইবেন। ধর্মপদে উক্ত হইয়াছে—

মেত্তাবিহারী যো ভিক্ষু পসম্মো বুদ্ধ সাসনে ।

অধিগচ্ছে পদং সমুত্তং সম্ভারুপসমং সুখং ॥

নির্বান-মধু বা অমৃতলাভের জন্য বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যকে সাধনার যে পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয়ের কল্যাণ-পন্থা। সাধককে প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে সংযত হইয়া পথ

চলিতে হয়। এই চলার পথেও তিনি আনন্দ-লাভ করিয়া থাকেন :—

“নিদ্রয়ো হোতি নিগ্ধাপো ধম্মপীতি রসংপিব” ধর্ম্মপ্ৰীতিরস পান করিতে করিতে সাধক নির্ভীক ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। নিষ্পাপ হইবার জন্ম সাধক যে মানস-সংগ্রাম করেন, সেই সংগ্রামে আনন্দ আছে; এবং তিনি যখন জয়লাভ করেন, সেই বিজয়গৌরবেও আনন্দ আছে। সাধনপথে প্রত্যহ আনন্দরস পান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠে, তিনি সকল পাপ পরিহার করিয়া সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন। তিনি যে সুখ লাভ করেন, তাহা ভোগের সুখ নহে, ত্যাগের সুখ, সংযমের সুখ। এই সুখকেই পরম আনন্দ বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনার শেষেই তিনি নিব্বানং পরমং সুখং” লাভ করেন। নির্বাণ ও বিশ্বমৈত্রীর বক্তা ও প্রচারক ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিকে আর্চাজিক সাধনা ও ধ্যানের কথা শুনাইয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদিগকে সংঘের নিকটে, লোকসমাজে এবং আপনাদের অস্তুরে বাহিরে সত্য হইবার জন্ম উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষু এইরূপে সকলদিক দিয়া সত্য হইয়াই পরিণামে বৃহৎ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

বিনয়-পিটকে ভিক্ষুজীবনের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী, আহার বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি এমন বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সেগুলি কেহ কেহ বাহুল্য

মনে করিতে পারেন। সংঘের যখন উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সুদূর অতীতকালের সহিত আমাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র এমন ছিল হইয়া গিয়াছে যে, এখন আমরা সেকালের সকল কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে, প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে সত্যতার এমন একটি উজ্জ্বল ছবি দৃষ্ট হয় যে, সে ছবির গৌরব কখনো ম্লান হইবে না।

নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের বাসনা ছোটবড় পণ্ডিত-মুখ সাধু-অসাধু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আৰ্য্যঅনার্য্য সকলের মনেই স্বভাবতঃ জাগিয়া থাকে। বুদ্ধ এই জন্ম সাধনার পথটি এমন সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, সেখানে কাহাকেও অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হইবে না। তিনি স্বয়ং যাহাদের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই অনার্য্য ও অশিক্ষিত। সুতরাং তিনি সোজা কথা, সাধারণের ভাষায় সরস অখ্যান সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যেরা যাহাতে কথাগুলি মনে রাখিতে পারে, সেইজন্ম তিনি এককথার পুনরুক্তি করিতেও দ্বিধা মনে করেন নাই। এই পুনরুক্তি সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ শ্রোতার কাছে তাহা অত্যাবশ্যক ছিল। সংঘে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিয়া তিনি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান যাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা শোকে-তাপে জর্জরিত বলিয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া সজ্ঞ প্রবেশাধিকার পাইলেই, কেহ কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহের হাত এড়াইলেন এমন হইতেই পারে না। তাঁহাকে প্রত্যেক মুহূর্তে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। সাধনার প্রভাবে একদিন বিষয়বাসনা সংযত করিয়া তিনি উপশান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সে দিন তাঁহার দেহ শান্ত, বাক্য শান্ত ও চিত্ত শান্ত হইবে।

কিন্তু এই বাঞ্ছিত জীবনলাভের পূর্বে সংঘের ভিক্ষু সাধারণ মানুষ মাত্র; সুতরাং তাহার সাধনার পথের সমস্ত বাধা তাহার নিকটে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছেই। ছোট ছোট দুর্বলতাগুলি মানুষকে কতখানি দুর্বল ও অসহায় করিয়া ফেলে লোক-শিক্ষক বুদ্ধ তাহা সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই, তিনি গৃহত্যাগী ভিক্ষুকেও আচারব্যবহারে, আহারেবিহারে, কোন দিক্ দিয়া বিন্দুমাত্র অশিষ্ট বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিতেন না। ভিক্ষুর জীবনে কোন কার্যে শিথিলতা বা নিরুদ্যম প্রকাশ পাইবে না। ভিক্ষুকে সংঘের ও সমাজের মধ্যে সর্বত্রই সমভাবে ভদ্র হইতে হইবে।

ধর্ম্মনৈতিক উচ্চ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, আর কোন ভিক্ষুর প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহার, কাহাকেও নিন্দা করা, কাহারও প্রতি অযথা দোষারোপ, ভিক্ষুমণ্ডলীর সহিত অকারণ বাগ্ বিতণ্ডা বা ছলনা, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কাহাকেও সংঘের অবাসস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা কিংবা আঘাত করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যখন অপর ভিক্ষুরা কলহ করেন তিনি আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের বিবাদ

শুনিবেন না। কোন কার্যের আরম্ভে তিনি সম্মতি দিয়া পরে কখনো তাহাতে আপত্তি তুলিতে পারিবেন না। সংঘের ভিক্ষুরা যখন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সম্মিলিত হইবেন তখন তিনি নিজের মত না জানাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। যাহাতে সঙ্ঘে ভিক্ষুদের ভেদসংঘটন হইতে পারে, তিনি স্বয়ং এমন আচরণ করিবেন না, কিংবা অন্য কাহার দৃষ্টি তেমন কোন বিষয়ে আকর্ষণ করিবেন না।

সংঘের সমস্ত দ্রব্যাদি সংঘবাসীদের সাধনার সম্পত্তি। সেইগুলি রক্ষার সম্বন্ধে ভিক্ষুকে উদাসীন হইলে চলিবে না। শয্যা, আসন, পীঠ প্রভৃতি কোন জিনিষ যদি তিনি রৌদ্রে বা বাতাসে বাহির করেন, কিম্বা অন্যের দ্বারা বাহির করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেগুলি তুলিয়া না রাখিয়া কিম্বা তোলাইবার ব্যবস্থা না করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। সংঘের অভ্যন্তরস্থ গৃহের শয্যা ও আসনগুলির উপর ধপাস্ করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন বা উপবেশন নিষিদ্ধ। এইরূপ করিলে দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত গৃহ শ্রীহীন হইবার কথা।

গৃহত্যাগী ভিক্ষুকে তাঁহার বৃহৎ ধর্মপরিবারের মধ্যে এইরূপ সংযত ও শিষ্ট হইতে হইবে। তাঁহার আহার প্রণালীও অশোভন বা অসংযত হইলে চলিবে না। ছোট গোলাকার গ্রাস তুলিয়া তিনি মুখে দিবেন, আহাৰ্য্য দ্রব্য মুখের কাছাকাছি আসিবার পূর্বেই মুখব্যাদান করিবেন না। খাবার জিনিষগুলি সমস্ত হাতে মাখা, সমস্ত হাতটা মুখের ভিতর প্রবেশ করান,

গ্রাসগুলি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া, খাইতে খাইতে কথা বলা, গ্রাসগুলি মুখে পুরিয়া অনাবশ্যক নাড়াচাড়া, গাল ফুলান, অাহার সময়ে হাত বুলান, ভাত ছড়ান, জিভ্ বাহির করা, হস্‌হাস্‌ শব্দ করা, আঙ্গুল, ওষ্ঠ, অধর কিম্বা ভোজন পাত্র লেহন, এবং উচ্ছ্রিত হাতে জলপাত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

জনপদে যাতায়াত বা বাস করিবার সময়েও ভিক্ষুকে সর্ববতোভাবে ভদ্র হইতে হইবে। পরিশুদ্ধ বহির্বাস ও অন্তর্বাস দ্বারা তিনি সকল অঙ্গ আবৃত করিবেন, তাঁহার হাঁটু ও নাভি দেখা যাইবে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত হইবে ও তিনি অধোদৃষ্টিতে রহিবেন। কি চলিবার সময়ে, কি স্থিরভাবে অবস্থান সময়ে—তিনি কখনও উচ্চহাস্য করিতে পারিবেন না, এবং মৃদু কণ্ঠে কথা কহিবেন। তাঁহার পক্ষে এই সময়ে, শরীর, মস্তক ও বাহু দোলান নিষিদ্ধ। কটিদেশে হাত রাখিয়া, কিম্বা মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া তিনি জনপদে বিচরণ করিতে পারিবেন না।

লোকালয়ে নরনারীর সম্মুখে তিনি সোজা হইয়া বসিবেন ; কাৎ হইয়া চিৎ হইয়া বা জানুর উপর চাবর তুলিয়া বসিবেন না। তাঁহাকে পিণ্ডপাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদরপূর্বক প্রয়োজনানুরূপ আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে পিণ্ডদাতা গৃহীর অসুবিধা ঘটতে পারে, কিম্বা ভিক্ষুর মুখরোচক উপাদেয় আহাৰ্য্য গ্রহণের প্রতি লালসা প্রকাশ পাইতে পারে—ভগবান্ বুদ্ধ এমন অসংযত ব্যবহারের কদাচ প্রশ্রয় দিতেন না। নিয়ম আছে, সুস্থকায় ভিক্ষুরা পান্থশালার একবেলামাত্র আহাৰ

করিতে পারিবেন। দিবা বিপ্রহরের পরে পিণ্ডগ্রহণ নিষিদ্ধ। দল বাঁধিয়া পাঁচ ছয় জনে কাহারো গৃহে ভিক্ষায় যাইবেন না। গৃহী যেমন ভাবে যাহার পরে যাহা খাইতে দিবেন, ভিক্ষুরা তেমনি আহার করিবেন। “আগে ইহা চাই” এমন ভাবে ফরমাস করিতে পারিবেন না। স্নানকায় ভিক্ষু কখনো মধু, নবনীতাদি চাহিয়া খাইতে পারিবেন না। কোন ভিক্ষু ভোজন সমাপ্ত করিবার পরে অন্য কোন ভিক্ষু তাঁহাকে আবার আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না। সময়ান্তরে আহার করিবার জন্য ভিক্ষু কোন খাদ্যদ্রব্য সরাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কোনো গৃহী ভিক্ষুকে যত খুসী আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও, তিনি দুই তিন পাত্রে বেশী লইবেন না। ঐ খাদ্য অন্য ভিক্ষুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। কোন ভিক্ষু ভোজবেলায় বলপূর্বক কোন গৃহীর ঘরে প্রবেশ করিবেন না।

ভিক্ষুরা যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে বিনা প্রয়োজনে উপদেশ দিয়া বেড়াইবেন—লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের অনুশাসন তেমন হইতেই পারে না। যে ব্যক্তি বিলাসে মগ্ন, উপদেশ পাইবার নিমিত্ত যাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া উঠে নাই, অথবা যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ধর্ম্য কথা শুনান নিষিদ্ধ। ভিক্ষু কখনো ছত্রধারী, যন্ত্রধারী, অস্ত্রধারী পাছুকাপরিহিত, যানারোহী, শয়িত, হেলান দিয়া উপবিষ্ট, উষণীধারী কিম্বা রোগী ব্যক্তিকে ধর্ম্যোপদেশ দিবেন না। পশ্চিমধ্যে ধর্ম্যকথা শুনান বিধেয় নহে।

ছোট বড় এমন অনেক বিধিনিষেধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মানিয়া

চলিতে হইত। বৌদ্ধ গৃহী বা শ্রাবকেরও প্রতিপাল্য নিয়ম
অভাব নাই। বৌদ্ধ সাধনা বাসনা বর্জনের সাধনা হইতে
প্রকৃত বৌদ্ধ ঘরেবাহিরে, বিহারে-জনপদে কোনোখানেই শিষ্ট
জড়তা ও লৌকিকতা বর্জন করিতে পারেন না। বৈরাগ্যে
উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি যদি সংসারের সাধারণ লোকে
সুখ সুবিধা উপেক্ষা করিয়া, সমাজের উপদ্রবের কারণ
তাহা হইলে তিনি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতেন।

বৈরাগ্যের সাধক হইলেও বুদ্ধ-শিষ্যের আচরণে কে
শিথিলতা, অশিষ্টতা ও জড়তা স্থান পাইত না। ইহারই ক
সংঘের মধ্যে যে অপূর্ব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা
সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ-শিষ্যে
শিক্ষণীয় শিষ্টতা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অসং
অন্ধকার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও উপেক্ষণীয় নহে।



বোধি-ক্রম গুলে হস্তার প্রণতি

(জাতকখান)

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধবিধি ও সজ্জের প্রকৃতি

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস একান্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও একথা একরূপ সর্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকালেই ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার উদার ধর্ম্বারা আৰ্য্য ও অনার্য্য দ্বন্দ্বের সমাধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; অথবা তাঁহার সার্বভৌম ধর্ম্বের পুণ্যপ্রভাব আপনা আপনি বিবাদরত আৰ্য্য-অনার্য্যদিগের মনোমালিন্য দূর করিতেছিল ।

বুদ্ধের ধর্ম্ম ও সজ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ইহাই সর্ব-প্রথমে দেখা যায় যে, ধর্ম্বের মিলন-মন্দিরের চারিদিকে তিনি কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া বাধার সৃষ্টি করেন নাই । এই জগৎ আৰ্য্য অনার্য্য প্রত্যেকেই বলিতে পারিল “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সজ্জং শরণং গচ্ছামি,” বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সজ্জ জাতিবর্ণনির্বিচারে সকলের আশ্রয় হইল । বুদ্ধের বাণী কেবল উচ্চবর্ণের কতিপয় পণ্ডিতের উপভোগ্য হইল না, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর পতিতেরাও ইহার ভাগ পাইয়াছিল । ফলে এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতে যে জাগরণ দেখা গিয়াছিল সেই জাগরণ সাম্প্রদায়িক নহে—উহাতে সকল দেশই জাগিয়া উঠিয়াছিল । সেই জাগরণ শিল্পবিজ্ঞান, সাহিত্যদর্শন, সমাজসংস্কারে সকল দিকেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ।

বুদ্ধ যে মুক্তির বাণী প্রচার করিলেন তাহা অনার্যের কর্ণ-গোচর না হইলে ক্ষৌরকার উপালী ধর্মশাস্ত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা হইতে পারিতেন না এবং পতিতা বারাজ্জনা আত্রিপালী ভিক্ষুণীর শিরোমণি হইতেন না। স্ববির শীলবানের মুখে আমরা এই আশ্চর্য্য বাণী শুনিলাম যে, তিনি চণ্ডাল হইয়াও এই ধর্ম প্রভাবে সকল মানবের পূজনীয় হইতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্যে ও সজ্জে সাম্যের এই ছাপ বাহির হইতেই দেখা যাইতে পারে।

বৌদ্ধসাধনা দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা। এই জন্য ভগবান্ বুদ্ধ মৈত্রী ও মঙ্গল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। মৈত্রীভাবনার দ্বারা মানুষের মন উদার ও প্রসন্ন হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য কথা। “সমুদয় পুরুষ, সমুদয় স্ত্রী, সমুদয় আর্ধ্য, সমুদয় অনার্য্য, সমুদয় দেবতা, সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় অমনুষ্য, সমুদয় প্রেতপিশাচ নরকের জীব শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হউক, রোগহীন হউক, সুখী হউক।” এই প্রকার ভাবনার মধ্যে মনটিকে ডুবাওয়া রাখিলে মন ক্রমশঃ সকল গ্লানি, পাপতাপ হিংসাদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সকল আর্ধ্য ও অনার্য্যকে বুদ্ধ এই ভাবনার মন্ত্র দান করিয়াছেন এবং এই মৈত্রীর মন্ত্র তিনি কৃপণের ধনের মত সম্প্রদায়ের সিন্ধুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই কথা কাহাকেও বলেন নাই যে পুণ্যমন্ত্রে ইহার অধিকার আছে, ইহার অধিকার নাই। তাঁহার এই মৈত্রীর মন্ত্রই সজ্জের সৃষ্টির মূলে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া

থাকিবে। এই মৈত্রী মন্ত্রের উদারতা ও সাম্য বৌদ্ধ সঙ্ঘকে মঙ্গল-শ্রী দান করিয়াছিল।

বুদ্ধশিষ্যের ভাবনা যেমন মৈত্রী, অনুষ্ঠান তেমনি মঙ্গল। এই মঙ্গলকে বুদ্ধশিষ্য তাহার জীবনের প্রধান পাথেয় বলিয়া জানেন। এই মঙ্গলকে তিনি অঙ্গের অলঙ্কার করিয়া নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই মঙ্গল অর্থাৎ শীল প্রতিপালন দ্বারা তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন সংযত ও সুন্দর করিবেন। এই শীলই তাঁহার নির্বাণ বা অমৃতপুরে প্রবেশের দরজা।

মঙ্গলকে যিনি স্বীকার করেন, তাহাকে একমাত্র আপনার সুখ ও সুবিধার দিকে চাহিলে চলে না। কারণ যাহা একের পক্ষে মঙ্গল অন্যের পক্ষে মঙ্গল নহে, তাহা প্রকৃত মঙ্গলই নহে। যাহা আজ মঙ্গল এবং চিরকাল মঙ্গল, যাহা একজনের মঙ্গল এবং সকলের মঙ্গল, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। মঙ্গল কি তাহা বুঝিবার জন্য কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, সাধারণ সোজা বুদ্ধি দিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ বুদ্ধ এই মঙ্গলকেই প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মানুষের সাধারণ বুদ্ধি তাঁহার ধর্মকে স্বীকার করিতে কোনপ্রকার বাধা অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ সঙ্ঘে শ্রমণ ও শ্রামণেরদিগকে এত যে বিধিনিয়ম মানিয়া চলিতে হয় সেখানেও দেখা যায় যে, সেই বিধিনিয়মগুলির দ্বারা মঙ্গলশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া থাকে। ভাল

হইয়া উঠিবার জন্ম মানুষকে স্বেচ্ছায় যাহা মানিতে হয় [“প্রাণী
বধ করিব না,” “চুরি করিব না,” “ব্যভিচার করিব না,” মিথ্যা
কহিব না,” “সুরাপান করিব না” ইত্যাদি] শীলগুলি তেমনই
হুজবিধি। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ এই সোজা
কথাগুলি ভুলিয়া যায়। এইজন্ম এই সোজা নীতিগুলিও
বারংবার স্মরণ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।
সুতরাং এই শীলগুলি মানিয়া চলিলে কাহারো স্বাধীনতা খর্ব
হইতে পারে না, পরন্তু ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার দূর হইলে সকল
মানুষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কথা।

সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সাধকের স্বাধীনতা কোনদিকে
বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই—কারণ তিনি আপনি আপনার অবলম্বন
এবং আপনার বীর্যকে ও শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তিনি
আপন অধ্যবসায় বলেই নির্বাণলাভ করেন। সজ্জের মধ্যেও
এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রবাণ ও নবীন ভিক্ষুদিগের
প্রতিপাল্য নিয়মের যতই বাহুল্য থাকুক না কেন সেখানেও
মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধাই দেখানো
হইয়াছে। সজ্জের নিম্নতম নবীন ভিক্ষুকেও কোন কারণে
অনাদৃত হইতেন না। প্রত্যেক ভিক্ষুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
রক্ষার জন্মই বিধি হইয়াছে—

(১) কোন ভিক্ষু ঈর্ষা বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অথ
কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে ব্যভিচার চৌর্য্যাদি কোন দোষ অথবা
আরোপ করিলে অপরাধী হইবেন।

(২) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অন্নবিধা ঘটাইবার অসদভিপ্রায়ে তাঁহার বাসস্থান অংশতঃ অধিকার করিলেও অপরাধী হইবেন।

(৩) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সজ্জ হইতে তাড়াইয়া দিলে অপরাধী হইবেন।

(৪) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে কিংবা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গী করিলে অপরাধী হইবেন।

(৫) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর মনে ধর্মবিষয়ে সংশয় জন্মাইয়া দিলে অপরাধী হইবেন।

সজ্জ মধ্যে কোন ভিক্ষু বিনা কারণে অগ্ৰকর্তৃক যাহাতে নিন্দিত, লাঞ্চিত, অপমানিত কিম্বা উপদ্রুত না হইতে পারেন তাহারই জন্য উল্লিখিত বিধিগুলি প্রণীত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরন্তু যিনি ভিক্ষুরূপে সজ্জ স্থান পাইয়াছেন সজ্জের প্রত্যেক সাধারণ অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ রহিয়াছে। বৌদ্ধ সজ্জের বিধিব্যবস্থাগুলি পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই দেখা যায় যে, সজ্জের ভিক্ষু সজ্জকেই শ্রদ্ধাপূর্বক মানিয়া চলিতেন, অপর কোন শক্তিশালী ভিক্ষুর শাসন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত না। গণতন্ত্রতার বিধান অনুসারেই সজ্জের সাধারণ কর্তব্যগুলি নিষ্পন্ন হইত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপসম্পদাগ্রহণের বিধি আলোচিত হইতে পারে। কোন নবীন ভিক্ষু উপসম্পদাগ্রহণের প্রার্থী হইলে

সজ্জ তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য একজন শ্রমণ নিযুক্ত করিবেন। উপদেষ্টা ভিক্ষু সজ্জের সম্মুখে বিজ্ঞপ্তি করিবেন—

“মাননীয় ভিক্ষুগণ, অমুক ব্যক্তি উপসম্পদাগ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছেন, সজ্জ যদি সম্মতি প্রদান করেন আমি তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি।” দীক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে উপদেষ্টক সজ্জের সম্মুখে নিবেদন করিবেন—

“মাননীয় ভিক্ষুগণ, দীক্ষার্থী অমুক ভিক্ষুকে আমি যথাবিহিত উপদেশ দিয়াছি, আপনাদের অনুমতি হইলে তাঁহাকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি।” সজ্জের সম্মতি পাইয়া দীক্ষার্থী যথাযোগ্য বসন পরিধান করিয়া সম্মিলিত ভিক্ষুদের সমীপে যুক্তকরে নিবেদন করিবেন—

“মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি উপসম্পদাগ্রহণের ইচ্ছা জানাইতেছি, অনুকম্পা করিয় আমাকে উপসম্পদা-দান করুন।” দীক্ষার্থী তিনবার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার উপদেষ্টা বলিবেন—

“মাননীয় ভিক্ষুগণ, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তি অমুক ভিক্ষুর নিকট উপসম্পদাদীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, আপনাদের অনুমতি হইলে আমি দীক্ষার্থীকে এই দীক্ষা গ্রহণের সম্বন্ধে যাহা যাহা বাধা আছে একে একে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করি।” সজ্জ অনুমতি প্রদান করিলেন; তখন উপদেষ্টা একে একে প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্নোত্তর হইতে ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, দীক্ষার্থীর কুষ্ঠ, গণ্ড, শ্বেত, শ্বাস কিম্বা অপস্মার প্রভৃতি রোগ নাই; তিনি

স্বাধীন এবং অখণী ; তিনি রাজভৃত্য অথবা ক্রীতদাস নহেন ; তাঁহার বয়স বিশবৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং গৃহত্যাগের সময়ে তিনি মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছেন ।

এইরূপে সজ্জের ভিক্ষুরা যখন দীক্ষার্থীর সম্বন্ধে তাহাদের সকল জ্ঞাতব্য জানিয়া প্রসন্ন হইলেন তখন নবীনভিক্ষু উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া সজ্জমধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং ভিক্ষুর পূর্ণ অধিকার লাভে সমর্থ হন ।

দীক্ষাগ্রহণের সময়েই নবীন ভিক্ষু সজ্জের সম্মিলিত ভিক্ষু-গণের নিকটে প্রণত হইয়া সজ্জকে স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন । বুদ্ধ তাঁহার কাছে যেমন সত্য, ধর্ম্য তাঁহার কাছে যেমন সত্য, সজ্জও তেমনি সত্য ।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের বৌদ্ধ বিহারে সংসাব-ত্যাগী ভিক্ষুরা গণতন্ত্রতাকে এমন করিয়া সম্মান করিতেন । অধুনা সুসভ্যজাতিসমূহদের মধ্যে যেমন “Voting by ballot” অর্থাৎ ছোট ছোট গোলক বা টিকেট দ্বারা ভোট লইয়া বিচার করিবার রীতি দেখা যায় ; প্রাচীন বৌদ্ধ সজ্জ সেইরূপ সম্বলতার বিচার প্রণালী প্রবর্তিত ছিল । বিচারের জন্য ভিক্ষুরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শলাকা ব্যবহার করিতেন এবং শলাকা গণনা দ্বারাই মতবাহুল্য নির্ণীত হইত ।

কখন কোনো জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সজ্জের ভিক্ষু-দিগের মত গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তখন ভিক্ষুদের মধ্যে কোন সুযোগ ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত, অনুমোদিত

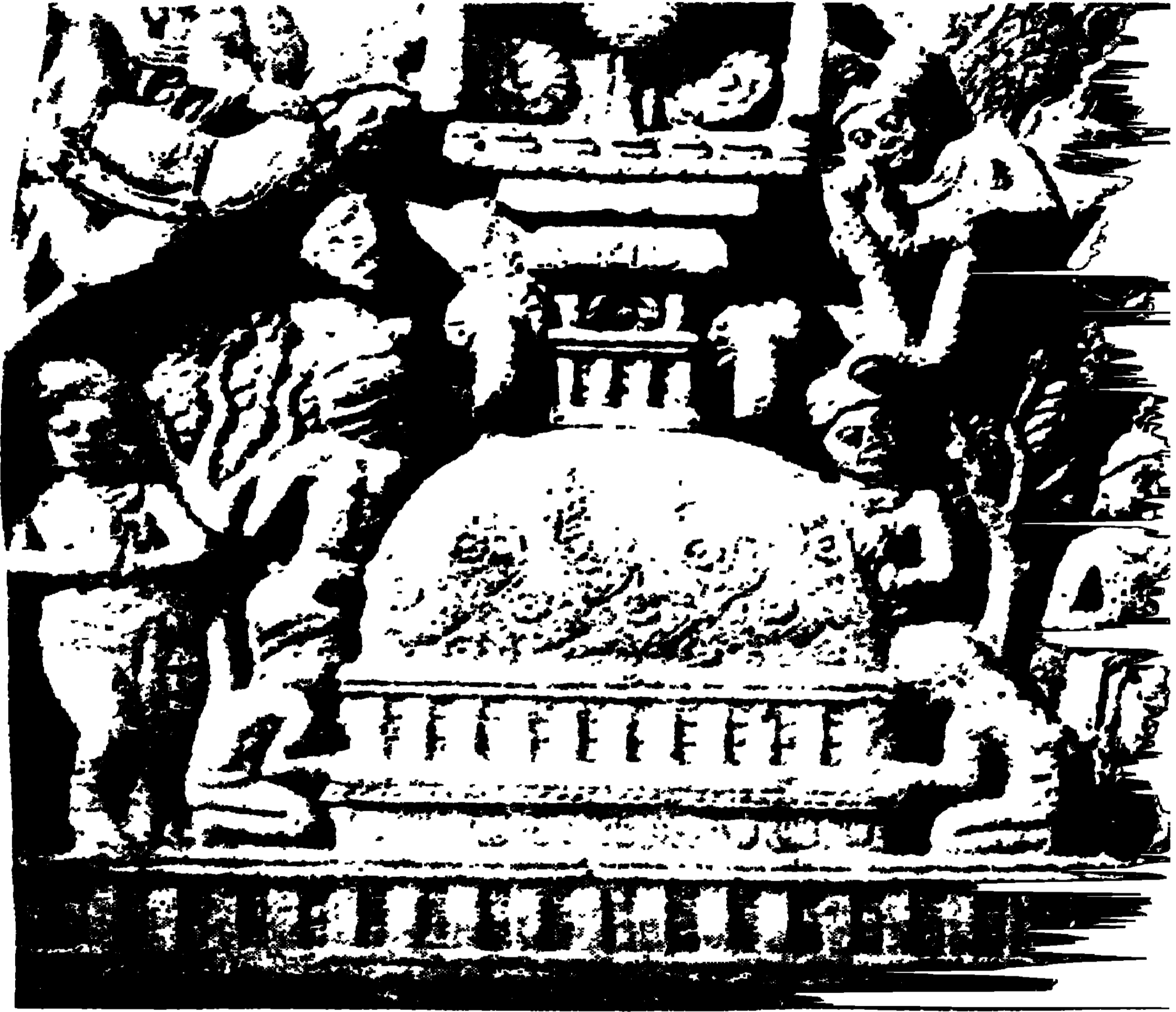
হইয়া শলাকা-গ্রহীতা বিচারপতি মনোনীত হইতেন। যিনি অপকৃপাত, অদেষ্টা, বুদ্ধিমান্ ও নির্ভীক নহেন তিনি কদাচ এমন সম্মানজনক পদ লাভ করিতে পারিতেন না। ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন দ্বারাই সম্মতি জানাইতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই বিচার প্রণালী আলোচনা করিলে স্পর্শই বোঝায় যে, তাঁহারা কাহারো ব্যক্তিগত মতকে উপেক্ষা করিতেন না। সজ্জের সর্ববিধ সাধারণ প্রশ্নের সহিত প্রত্যেকে ভিক্ষুর ব্যক্তিগত যে যোগ ছিল সেই যোগ সাম্য ও স্বাধীনতারই পরিচায়ক। এই যোগ স্বেচ্ছায় ছিন্ন করিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। পরন্তু এই স্বেচ্ছাচার অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত। এই জন্মই বিধি হইয়াছে :—

(১) সজ্জ যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত আছেন তখন আপনার মত প্রকাশ না করিয়া কোন ভিক্ষু চলিয়া যাইতে পারিবেন না।

(২) কোনো কার্যের আরম্ভকালে সম্মতি দিয়া কোন ভিক্ষু পরে ঐকার্যে আর আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৩) সজ্জ কোনো বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়াছেন কোনো ভিক্ষু সেই মীমাংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিতে পারিবেন না।

সামাজিক বাধা তুলিয়া দিয়া উচ্চনীচ আর্য্য অনার্য্য সকলে মিলিত হইয়া বুদ্ধের পবিত্র ধর্মের আশ্রয়ে সজ্জমধ্যে যে আশ্চর্য্য সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।



প্রস্তরোৎকর্ষণ স্তূপের চিত্র

‘ ভারততে প্রাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ

বিনয়পিটকের পাতিমোক্খভাগে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপাল্য নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। সেইগুলি পাঠ করিয়া পাঠক ভাবিতে পারেন, এত বাধা বাঁধন কেন? এত গুলি ছোটবড় বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ হয়তো ভিক্ষুদের স্বাধীনতার উপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

এই বিধিনিষেধগুলির পশ্চাতে বুদ্ধের ধর্ম্মে ও সংঘে স্বাধীনতার যে অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। বুদ্ধ যে নির্বাণ বা মুক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, সেই ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। অন্য কাহারো মুখাপেক্ষী না হইয়া মানুষ আপনি ভিতর হইতে ধার্ম্মিক হইয়া উঠিবে, সে আপনি আপনার অবলম্বন হইবে ইহাই তাহার উপদেশ। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মুক্তির পত্রিকা অথবা স্বর্গের চাবি হাতে করিয়া আসিয়া ধর্ম্মার্থীকে শাসাইবেন এমন বিড়ম্বনা বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। মানুষকে তিনি যে ধর্ম্মের উদারক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন, সেখানে তাহার মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গ বিকাশে কোন বাধাই ঘটিতে পারে না।

বুদ্ধের এই পবিত্র ধর্মের রসধারাসিক্ত উর্বরক্ষেত্রে সংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। সংঘ তাঁহারই সৃষ্টি, তথাপি তিনি কখনো আপনাকে সংঘের নেতা বা চালক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। অন্তিম জীবনে বৈশালীর বিহারে তিনি উপস্থায়ক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—“আনন্দ, সংঘ আমার কাছে কি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন? আমি অকপটে সকলের কাছে আমার উপলব্ধ সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, কোনো কথাই তো গোপন করি নাই। আমি কখনো এ কথা মনে করি না যে, আমি সংঘের চালক অথবা সংঘ আমার অধীন। যদি কেহ এমন মনে করেন, তিনি নেতার আসন গ্রহণ করিয়া সংঘকে দৃঢ়রূপে বাঁধিবার নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করুন। সংঘ রক্ষার জন্য আমি কোনো বাঁধা নিয়ম প্রণালী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না।”

মহাপুরুষ বুদ্ধের এই উক্তি অতি সুস্পষ্ট। সংঘের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কখনো আপনার অধীন করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রেমে ও সাধনায় সংঘ সৃষ্ট হইলেও তিনি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হইয়া শিশুটিকে একান্তভাবে আপনি কোলে আঁকড়াইয়া ধরিলেন না; পরস্তু তাঁহাকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে শ্রদ্ধাশীল শ্রাবক ও ভিক্ষুদের স্নেহরস পান করিয়া শিশু আনন্দে বাড়িতেছিল। এইরূপ স্বাধীনভাবে বাড়িতে পাইয়াছিল বলিয়াই এক সময়ে সংঘ ভারতব্যাপী সূর্যহৎ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৃষ্টিব্যাপারে বুদ্ধের কৃতিত্ব ও মহিমা তো আছেই; ভিক্ষুদের

ও লোক সাধারণের সহানুভূতি ও সংশ্রব সুস্পর্ষ দেখা যাইয়া থাকে।

বৌদ্ধ বিহারে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল সেই সভ্যতা বৌদ্ধসাধুদিগের ও তদানীন্তন জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় সংঘ অতি ক্ষীণ প্রারম্ভ হইতে ধীরে ধীরে মহৎ পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সংঘের নিয়মাবলী প্রয়োজনের তাগিদে এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নহে, অথবা কোনো বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে নির্দ্ধারিত হয় নাই। নিয়মগুলি সমাজের ও সংঘের মধ্যে আলোচিত হইয়া সাধারণ ভাবে গৃহীত হইত। লোকের দাবী, সুখ-সুবিধা ও প্রয়োজনাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম প্রণীত ও প্রবর্তিত হইয়াছে।

মহাবগ্গে “সান্ধিবহারিকের” কর্তব্য বিস্তারিত বর্ণিত আছে। নবীন ভিক্ষু অপর কোনো প্রবীণ ভিক্ষুকে উপাধ্যায় বরণ করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে জীবন যাপন করিবেন, এইরূপ নিয়ম আছে। উক্ত নবীন ভিক্ষু স্থবিরের সহিত একই বিহারে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে সান্ধিবহারী বা ‘সান্ধিবহারিক’ বলা হয়। এইরূপ উপাধ্যায়-বরণ-প্রথা প্রথমে ছিল না। দেখা গিয়াছিল, নবীন ভিক্ষুরা জনপদে যাইবার সময়ে যথোচিত বহির্বাস পরিধান করেন না, উচ্ছ্রিষ্ট পাত্রে অন্নের উচ্ছ্রিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আহার করেন, ভোজন সময়ে ভোজন-গৃহে—“ভাত চাই, ঝোল চাই” বলিয়া চীৎকার করেন।

তাহাদের এই অশিষ্ট ব্যবহারে জনপদবাসীরা উত্যক্ত হইত। এইরূপ ব্যবহারের কথা পরম্পর বলাবলি করিত এবং লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিত, “এ কেমন ব্যাপার, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা এমন অভদ্র বেশে লোকালয়ে ভিক্ষায় আসিয়া থাকেন? তাঁহারা ভোজন সময়ে ভোজনালয়ে এমন কোলাহল করেন কেমন করিয়া?”

জনপদবাসীদের এই সকল কথা মিতাচার, বিনীত ও বুদ্ধিমান্ ভিক্ষুদের কাণে গেল। তাঁহাদের মধ্যেও এই সকল কথার আলোচনা হইল। তাঁহারা এই অভিযোগের কথা ভগবান্ বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। তিনি অর্কবাচীন ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—“তোমাদের এমন ব্যবহার করা একান্ত অসঙ্গত, এরূপ করিলে লোকে এই ধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিবে না। পরন্তু যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারও শ্রদ্ধা হারাইয়া এই ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে সরিয়া পড়িবে। এই উপলক্ষে তিনি ভিক্ষুদিগকে একটি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, নির্বাণের শান্তি, সংঘের দ্বারাই লভ্য, শিষ্ঠতার দ্বারাই লভ্য এবং বীর্যের দ্বারাই লভ্য।

এই দিন স্থির হইল অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ভিক্ষু কোন প্রবীণ ভিক্ষুকে উপাধ্যায় বরণ করিয়া শ্রেয়োলাভের সাধনা করিবেন। শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় এক হইয়া নবীন ও প্রবীণ ভিক্ষু পিতাপুত্রের ম্যায় পরম্পরের সহায় হইবেন ও শ্রদ্ধাপ্রীতিতে তাঁহাদের সম্বন্ধ মধুর হইয়া উঠিবে।

এইরূপে যে সার্কবিহারীর জন্ম উপাধ্যায় গ্রহণের বিবিধ প্রবর্তিত হইল, এই বিধি ভগবান্ বুদ্ধ প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিধি কি সজ্জের শাস্তশিষ্ট ভিক্ষুরা প্রার্থনা করেন নাই? জনপদবাসীদের অভিযোগের মধ্যেও কি এমনই একটা অভিলাষ ব্যক্ত ছিল না?

এমন করিয়া বৌদ্ধবিধিগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের যে বিস্তৃত তালিকা আছে ভগবান্ বুদ্ধ তাহা প্রভুর মায় সজ্জের মাথায় বোঝার মত চাপাইয়া দেন নাই। বিধিগুলির প্রবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে দেশের লোকের ও সংঘের সাধুদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার

ভগবান্ বুদ্ধ কাশীর নিকটবর্তী মৃগদাব নামক স্থানে পঞ্চশিষ্য সমীপে তাঁহার সদ্বর্ষ প্রথমতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর কাশীধামে এই ধর্ম প্রচারিত হয়। এই নগরের বশ নামক এক বণিক তনয় বুদ্ধের মুখে নবধর্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাশীর প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। বশের মাতাপিতাও বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে নূতন ধর্ম ধীরে ধীরে যখন লোকমধ্যে প্রচারিত হইতেছিল তখনই প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত বুদ্ধশিষ্যদের সম্ভবদ্ব হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—“তোমরা দলবদ্ধ হইয়া সত্যপথে অগ্রসর হইতে থাক, একাকী সত্য-পথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ হয়ত দুর্বলতার বশবর্তী হইয়া বিপথগামী হইতে পারে। তোমরা পুণ্যে, প্রেমে ও সত্যানুরাগে এক হইয়া বহুজনের হিত কামনায়, এই আদিকল্যাণ, অন্তকল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ সদ্বর্ষের কাহিনী প্রচার কর। পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হউক। তোমরা লোকের কাছে ঘোষণা কর,



বুদ্ধ: উপদেষ্টা

তাহাদের জীবন পবিত্র। এই ধর্মবাণী নিঃসন্দেহ তাহাদের চিত্তস্পর্শ করিবে।”

এই সময়ে উরুবিল্বে কাশ্যপ নামক এক প্রসিদ্ধ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দুইভ্রাতা তাহাদের সহস্র শিষ্যসহ বুদ্ধের শিষ্য হওয়ায় নবধর্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন। বুদ্ধ শিষ্যগণ-সহ মগধের রাজধানী রাজগৃহে ধর্ম প্রচারার্থ গমন করেন। মগধরাজ নবধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বেণুবন নামক প্রমোদ উদ্যান বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে মগধ রাজ্যে নূতন ধর্ম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সুতরাং অঙ্গদেশ তখন মগধরাজ্যভুক্ত ছিল।

নবধর্ম প্রচার যাত্রায় বাহির হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তখন জীবিত ছিলেন। এই নগরের বহুলোক নবধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আনন্দ নবধর্ম দীক্ষিত হইয়া তাঁহার উপস্থায়ক হইলেন। আনন্দ মনোপ্রাণে ভগবান্ বুদ্ধের সেবা করিতেন, তিনি তাঁহার দক্ষিণ বাহুবৎ সর্বদা সঙ্গ সঙ্গ থাকিতেন। আনন্দ তাঁহার আঞ্জাপালনের নিমিত্ত সর্বদা এমনভাবে সতর্ক থাকিতেন যে, তাঁহাকে কদাচ দ্বিতীয় আহ্বান করিবার প্রয়োজন হইত না।

আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ নারীদিগকে সন্ন্যাস-দানে সম্মত হইয়াছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী সর্বপ্রথমে ভিক্ষুণী হইলেন। বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পুত্র রাহুলও নবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তনের পরে ভগবান্ বুদ্ধ প্রায় ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বৈশালী ও উহার নিকটবর্তীস্থানে ধর্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পাবার চন্দ নামক এক অনুরাগী শিষ্যের আশ্রয়স্থানে বাস করিয়া তিনি কিছুদিন ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। চন্দ একদিন তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। উহার পরে তাঁহার রক্তামাশয় রোগ জন্মে। অসুস্থ দেহেই তিনি কুশী নগরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একস্থলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। আনন্দ তাঁহাকে শুশীতল নির্মূল জল পান করাইয়া সুস্থ করেন। অতঃপর তিনি শিষ্যগণসহ হিরণ্যবতী নদীর তীরবর্তী কুশী নগরের উপকণ্ঠে মল্লদের শালবনে গমন করেন। এই উদ্যানেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—“হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পরে আমার প্রবর্তিত ধর্মই তোমাদের চালক হইবে।”

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপুরুষ বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার অস্থি প্রভৃতি দেহ-ধাতু গ্রহণ জন্ম আট রাজ্য হইতে প্রতিনিধিগণ কুশীনগরে আগমন করিয়াছিলেন। দেহ-ধাতুর বিভাগ লইয়া ইহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ অস্থি ভাগ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের অনুমতিক্রমে যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করেন। অস্থিবিভাগ শেষ হইবার পরে মৌর্যগণ কুশী নগরে আগমন করেন, তাঁহারা দেহধাতু না পাইয়া চিতার অঙ্গার লইয়া যান। এই সকলের দ্বারা উত্তরকালে আটটি শরীরস্তূপ, একটি কুস্তূপ এবং একটি অঙ্গারস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতবর্ষে অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, ভজ্জি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার, কাশ্মীর এই ষোলটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই এই সকলের অধিকাংশ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং, তাঁহার ধর্ম অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, ভজ্জি ও মল্ল দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের পরে একবিংশতি দিবসে তাঁহার দেহধাতু বিভক্ত হয়। ঐ দিবস মহাকাশ্যপ ভিক্ষু সংঘে প্রস্তাব করেন—“পঞ্চশত ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস গ্রহণপূর্বক ধর্ম ও বিনয় সমবেতভাবে আবৃত্তি করুন।” এই প্রস্তাব যথারীতি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইল।*

বেরভার পর্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহাধারে মগধরাজ অজাতশত্রু এক পরম রমণীয় সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

* প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্ঘীতির বিবরণটি সুহৃদবর ত্রীমুক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের এক রচনা হইতে সংগৃহীত হইল।

এই মণ্ডপের ভিত্তিস্তম্ভ ও সোপান স্ফুভিত্ত করা হইয়াছিল।

নানা প্রকার লতা ও মাল্যদ্বারা মণ্ডপ স্ফুচিত্ত করা হইয়াছিল।

1st Convention

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই মহাসঙ্ঘীতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। আনন্দপ্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু উপবিষ্ট হইলে সঙ্ঘস্ববির মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বিক্ষুগণ ধর্ম ও বিনয় ইহার মধ্যে কোন্টী আমরা প্রথমে আবৃত্তি করিব ?”

ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন—“মাননীয় মহাকাশ্যপ, বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ু, বিনয় থাকিলে বুদ্ধশাসন থাকিবে, অতএব প্রথমে আমরা বিনয়েরই আবৃত্তি করি।”

সঙ্ঘস্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে অগ্রবর্তী হইবেন ?”

আয়ুস্মান্ উপালি।

কেন আনন্দ কি সমর্থ নহেন ? তিনি যে সমর্থ নহেন তাহা নহে, কিন্তু ভগবান্ জীবিত অবস্থাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে বিনয়ধর (বিনয়স্ফ) সমূহের মধ্যে স্ববির উপালিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিনয় আবৃত্তি করিব।

অনন্তর মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন করিলেন—“বন্ধু উপালি, ভগবান্ প্রথম পারজিক (বিনয় পিটকের অন্তর্গত প্রাতিমোক্শের প্রথম নিয়ম) কোথায় বিধান করিয়াছিলেন ?”

তিনি বলিলেন—বৈশালীতে।

মহাকাশ্যপ বলিলেন—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ?

তিনি উত্তর করিলেন—কলন্দকপুত্র সূদন্তকে । এইরূপে মহাকাশ্যপ এক একটি নিয়ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর উপালি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন । এই প্রণালীতে ক্রমশঃ সমগ্র মহাবিভঙ্গ, ভিক্ষুনোরিভঙ্গ, খন্ধক (মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ) ও পরিবার উল্লেখ করিয়া তাহার নাম ‘বিনয় পিটক’ করা হইল ।

অনন্তর মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া ধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে পারা যায় ?”
ভিক্ষুগণ স্থবির আনন্দের নাম করিলেন ।

মহাস্থবির মহাকাশ্যপ প্রশ্ন করিলেন—“ভগবান্ ব্রহ্মজাল-সূত্র কোথায় কাহাকে কি জন্ম কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ?”
আনন্দ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন । এইরূপে অন্যান্য সূত্র সম্বন্ধেও প্রশ্নোত্তর হইল এবং নিকায়সমূহ (দীঘ, মজ্জিম সংস্কৃত, অঙ্গুত্তর ও খদ্দুক) সংগৃহীত হইল । ইহারই নাম ‘সূত্র পিটক’ ।

তারপরে পূর্ব প্রকারেই স্থবির অনুরুদ্ধকে ধর্ম্মাসনে স্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, কথাবথু, পুগ্গল, পঞ্জত্তি বনক ও পট্ঠান আবৃত্তি করিয়া অভিধর্ম্ম পিটক সংগ্রহ করিলেন ।

মহাপুরুষ বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পরে তাঁহার প্রচারিত বিনয় ও সূত্রই বৌদ্ধগণের শাস্ত্র হইল । এই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে লাগিল । ইহার শতবর্ষ পরে বৈশালীর ভিক্ষু-গণ দশটি নূতন অধিকার পাইবার জন্ম আন্দোলন আরম্ভ করেন ।

ভিক্ষুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা ঐ দশাধিকারের অন্ততম। এই বিষয় লইয়া বৈশালীর ভিক্ষুরা একমত হইতে পারেন নাই। ভিক্ষু কাকন্দকের পুত্র যশ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত তিনি বৈশালীতে এক মহাসমিতির আহ্বান করেন। তিনি পশ্চিম ভারত, অবন্তী এবং দক্ষিণ ভারতের ভিক্ষুগণ সমীপে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন—“মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা এই বিষয়ের আইনতঃ মীমাংসা করিবার জন্ত এখানে আগমন করুন। নচেৎ যাহা ধর্ম্য নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, ধর্ম্যই অবজ্ঞাত হইবে। যাহা বিনয় নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, বিনয় অবজ্ঞাত হইবে।”

বৈশালীর ভিক্ষুগণ যশের এই আন্দোলন জানিতে পারিয়া তাঁহারাও পূর্বদেশীয় সমস্ত ভিক্ষুকে স্বদলে আনিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদের মধ্যে দুইটি দল স্থাপিত হইল।

বৈশালী নগরে যখন ভিক্ষুমণ্ডলী মহাসভায় সমবেত হইলেন তখন প্রসিদ্ধ স্থবির রেবত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মাননীয় সজ্জ আমার কথা শ্রবণ করুন,—কয়টি নিয়মের বৈধতা সজ্জের আলোচ্য, এযাবৎ যত বক্তৃতা শুনিলাম তাহাতে বক্তারা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কেবল অবাস্তুর বাক্যই বলিয়াছেন, কতিপয় মধ্যস্থের উপর বিচার ভার অর্পণ করিয়া সজ্জ এই বিষয়ের মীমাংসা করুন।”

উভয় পক্ষের চারিজন করিয়া আটজন মধ্যস্থের উপর বিচার-

কার্য অর্পিত হইল। মধ্যস্থগণ সকলে একমত হইয়া বৈশালীর ভিক্ষুগণকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭৭ অব্দে বৈশালীতে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সাত শত প্রসিদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুদের দাবী অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু উভয়পক্ষ মধ্যস্থদের মীমাংসা গ্রহণ করিলেন না। এই সময় হইতে নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ 'মহাসাজিবক' এবং সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ 'খেরবাদী' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাসাজিবকেরা "মহাযান" এবং খেরবাদীর 'হীনযান' নামে পরিচিত হন।

বৌদ্ধধর্মের জাতিভেদ ছিল না, এই ধর্ম ব্রাহ্মণকে উচ্চবর্ণের নিমিত্ত বংশ গৌরব দান করিত না। এইজন্য মগধের অনার্যগণই প্রথমতঃ দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই আর্য্য সেই সকল দেশে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম তেমন অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

কোন ধর্ম যতই উচ্চ হউক না কেন, কতগুলি অনুকূল বাহ্য কারণ না ঘটিলে ঐ ধর্ম লোকমধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধের জীবিত কালে মগধরাজ বিম্বিহার ও অজ্ঞাত-শত্রু নূতন ধর্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তেমন শক্তিমান ছিলেন না, আপনাদের নাতিবৃহৎ রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদের কোনো প্রভু ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মগধ রাজ্য যখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত :

হইল তখন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষণে বৌদ্ধধর্ম ভারতের ধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের পিতামহ মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের অধীনতাপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়াছিলেন। . নর্মদা নদী হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বত পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। গ্রীকবীর সেলুকস্ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে গ্রীক শাসনাধীন পঞ্জাব ও কাবুল প্রদান করেন। বিজয়ী ভারতীয় বীরের সহিত তিনি স্বীয় দুহিতাকে বিবাহ দিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকালে হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতিই সুসভ্য ছিলেন, সুতরাং এই দুই জাতির মিত্রতা উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইয়াছিল। গ্রীকেরা ভারতীয়দের নানাবিদ্যা এবং হিন্দুরা গ্রীকদের জ্যোতিষ ও গণিত প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে বাস করিতেন। তাঁহার ভারতবিবরণে সেই সময়ের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ তখন ১১৮টি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হইয়াছিলেন।

অশোকের এই পরাক্রমশালী পিতামহ কিংবা তাঁহার পিতা-বিন্দুসার বৌদ্ধ ছিলেন না। অশোক যখন এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তখন এই ধর্ম নিখিল



ভিক্ষুবেশে সম্রাট অশোক

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে কোনো কোনো রাজ্যে প্রচারিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্তু বৌদ্ধ রাজকগণ সম্রাট অশোকের সম্বন্ধে যে সকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সকল পাঠ করিলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি নৃশংস ও পাপাচার ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পুণ্যময় জীবন লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম মহামতি অশোককে নবজীবন দান করিয়াছিল ইহা সত্য, কিন্তু তিনি উক্ত ধর্মগ্রহণের পূর্বে নিষ্ঠুর ও অধাৰ্মিক ছিলেন তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-ইতিহাসের শিরোভাগে মহামতি অশোকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রীমূলক ধর্ম ঐহাদের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হইয়াছে অশোক তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস তাঁহারই অনুশাসন-লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে কলিঙ্গ জয় করেন। ঐ যুদ্ধে বহু ব্যক্তির জীবন নাশ এবং বহু ব্যক্তি বন্দী হইয়াছিল। হিংসামূলক এই যুদ্ধ তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাঁহার শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে—“এই রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও সাধুরা মাতাপিতা ও গুরু-জনকে ভক্তি করে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর প্রতি ইহারা সদ্যবহার করে। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে

দেশে বাস করে সেই দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।” যাহারা নিরপরাধ, শিষ্ট ও সচ্চরিত্র তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিয়া অশোক স্বভাবতঃই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্মই তিনি অহিংসমূলক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে তিনি ধর্মযাজকরূপে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিরত হইলেন।

দীপবংস ও মহাবংসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ অশোক কাশ্মীর, গান্ধার, মহিসা (বর্তমান মহীশূর), বনবাস (সম্ভবতঃ রাজ পুতনা), অপরন্তক (পশ্চিম পঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যোনলোক (বাক্‌ট্রিয়া ও গ্রীকরাজ্য সমূহ), হিমবত (মধ্য হিমালয়), সুবর্ণভূমি (খাটন অর্থাৎ নিম্ন ব্রহ্মদেশ), এবং লঙ্কা-দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলা (মাদ্রাজ), পাণ্ড্য (মাদুরা), সত্যপুরা (সাতপুরা পর্বতশ্রেণী), কেরল (ত্রিবান্দুর), সিংহল, সিরিয়ার গ্রীকরাজ এণ্টিয়োকাসের রাজ্যে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছিল। অপর এক অনুশাসন লিপিতে প্রকাশ যে, তাঁহার দূতগণ সিরিয়া, মিশর, এপিরস্, মেসিডন্ এবং সিরিনের গ্রীকরাজাদের সমীপে গমন করিয়াছিল।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত করিবার জন্ম সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ম তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও দুহিতা সজ্জমিত্রাকে

সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলরাজ তিস্‌স এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহলরাজকুমারী অমুলা সঙ্ঘমিত্রার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

রাজর্ষি অশোক এমন ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন যে, ধর্ম্ম তাঁহার নিকট পুত্র, কলত্র ও বিত্ত হইতেও প্রিয়তর ছিল। দেশের সর্বত্র লোকের মনে বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্ব ও সুনীতি মুদ্রিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কত স্তূপ, কত মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার যথার্থ সংখ্যা এখনও নির্ণীত হয় নাই। গিরিগাত্রে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাস্তম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মের সুনীতি ও সদুপদেশ উৎকীর্ণ করাইয়া লোককল্যাণ সাধনে তিনি যেমন আশ্চর্যিক আকাঙ্ক্ষা দেখাইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

তাঁহার শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি দ্বারা তিনি লোকসাধারণকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন—(১) কেহ প্রাণী হত্যা করিও না (২) প্রধান প্রধান নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ প্রদান করিও না (৩) মাতাপিতার বশ্যতা স্বীকার কল্যাণপ্রদ (৪) বন্ধু ও স্বজন-বর্গ, আত্মীয়কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রতি বদাম্ব হওয়া বিধেয়। (৫) মিতব্যয়ী ও বিবাদে নিবৃত্ত হওয়া অতি উত্তম। (৬) আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা এই করটিগুণ অতি উৎকৃষ্ট, দরিদ্রেরাও এই সকলগুণ প্রদর্শন করিতে পারে। (৭) লোকে আরোগ্যলাভ, বিবাহ, সম্মানলাভ, প্রভৃতি উপলক্ষ্যে আপন সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ জন্ম উৎসব করিয়া থাকে।

এই সকল উৎসব বিকৃত ও অকিঞ্চিৎকর। ধর্মবিষয়ক উৎসবই বস্তুতঃ সৌভাগ্যজ্ঞাপক। ধর্মোৎসবের মূলকথা দাস-দাসী ও ভৃত্যবর্গের প্রতি যথাবিহিত ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি সম্মান ব্যবহার, প্রাণীদের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রতি বদাশ্রুতা। চির-কল্যাণ সাহায্য কাম্য তাহাকে এইরূপ উৎসবই করিতে হইবে। (৮) তোমার সহিত সাহায্য ধর্মমত এক নহে এমন গৃহী অথবা সন্ন্যাসী যে-কোনো ব্যক্তির ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। আপনার ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিবার জন্য অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ অসঙ্গত। বাক্যে সংযত হওয়া বিধেয়। (৯) ধর্ম কল্যাণপ্রদ, কিন্তু ধর্ম কাহাকে বলে? লালসার নিবৃত্তি, অপরের কল্যাণ-সাধন, করুণা, বদাশ্রুতা, সত্যানুরাগ এবং পবিত্রতাই ধর্ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে। লোকে স্বকৃত উৎকৃষ্ট কার্যের গর্ব করিয়া থাকে কিন্তু স্বকৃত দুষ্কার্যের প্রতি অন্ধ। আত্ম-কল্যাণ-সাধনের জন্য আত্মপরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্য মৌর্য্যভূপতিদের শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে 'রাজুক', 'প্রাদেশিক', 'মহাপাত্র', 'যুক্ত', 'উপযুক্ত', 'লেখক', 'উপাধিধারা', এই সকল রাজ কর্মচারী ছিলেন। মৌর্য্যভূপতিদের রাজ্য সুশাসিত, সুগঠিত ছিল এবং মৌর্য্য রাজাদের শাসনকালের বিবরণ যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। মহামতি অশোক তাঁহার রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষ হইতে "ধর্মমহাপাত্র",

‘ধর্মযুক্ত’, উপাধিধারী একদল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের জনমণ্ডলী ধর্মবিধি প্রতিপালন করে কিনা ধর্মবিভাগীয় ঐ সকল কর্মচারী তাহাই পরিদর্শন করিতেন। দক্ষিণ ভারতের চোলা, পাণ্ড্য প্রভৃতি কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি আফ্গানিস্থান, বেলুচিস্থান, দক্ষিণ হিন্দুকুশ প্রভৃতি রাজ্য সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার এই সুবিস্তৃত রাজ্যের সর্বত্র যেরূপ অসংখ্য স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা সুনিশ্চিত যে, অশোকের ধর্মরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। অশোক-প্রেরিত-ধর্মপ্রচারকগণ এসিয়া, ইয়ুরোপ এবং আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্মপ্রচারের ইতিবৃত্ত পরম বিস্ময়কর। বৌদ্ধধর্মের মহোচ্চ আদর্শের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ হেতু তাঁহার অন্তরে ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষারূপ যে বহি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা ধারণার অতীত।

সম্রাট্ অশোক রুগ্ন নরনারী ও জীবজন্তুর জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অসামান্য জীবপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে জীবসেবার এই আদর্শ তিনিই সর্ব প্রথমে প্রদর্শন করেন। অশোকের মত প্রসিদ্ধ ভূপতি পৃথিবীর ইতিবৃত্তেই বিরল। তাঁহার পুণ্যময় নাম অত্যাধি যত লোকের মুখে কীর্তিত হইয়া থাকে, সারলমেন বা সিজারকেও তত অধিক লোকে স্মরণ করে না। ইয়ুরোপের বন্যা নদী হইতে এসিয়ার পূর্বপ্রান্তস্থিত জাপান এবং সাইবিরিয়া

হইতে সিংহল পর্যন্ত দেশে দেশে সংখ্যাভীত নরনারী ধর্মপ্রাণ অশোকের নাম এখনও শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকে। অশোকাবদান, দীপবংস, মহাবংস এবং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ভাস্কর বুদ্ধঘোষ-প্রণীত বিনয়-ভাষ্যে সম্রাট অশোকের গৌরবময় জীবনের কীর্তিকাহিনী বিবৃত রহিয়াছে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত এক সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু পাটলীপুত্র নগরে এক মহাসভায় মিলিত হইয়াছিলেন। মাননীয় ভিক্ষু তিস্‌স এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক বহু সংশয় ছিন্ন হইয়াছিল। ঐ সভায় তিস্‌স যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কথাবত্থু নামে খ্যাত। উহা অভিধর্মের সপ্তম খণ্ডরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

বুদ্ধঘোষকে বৌদ্ধশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার নিবাস মগধে। তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ভাষ্য রচনা করিয়া অমরকীর্তি অর্জন করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দে সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ৬৩৮ অব্দে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এখান হইতে সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত রাজ্যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে

কাশ্মীররাজ পুষ্যমিত্র ! বৌদ্ধদিগকে নির্যাতন করিয়া কু-কীর্তি অর্জন করেন ।

তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্রের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল । গ্রীক সেনাপতি রাজা মিথ্রার এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন । ইনি মহাস্থবির নাগসেনের সহিত বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন উহা “মিলিন্দপঞহো” নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । মহাযান বৌদ্ধদের এই ধর্মগ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধগণও পরম শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষণ বংশীয় নরপতি কণিক কাশ্মীর জয় করেন । বিদ্যাগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারত, কাশ্মীর, ইয়ারখণ্ড, খাস্গর, খোকন প্রভৃতি রাজ্য এই প্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতির করতলগত হইয়াছিল । সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্যবংশের গৌরবরবি অন্তমিত হইয়াছিল । তাঁহার পরে কণিকের তুল্য শক্তিশালী রাজা ভারতবর্ষে আর রাজত্ব করে নাই । সম্রাট কণিকও বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । স্তূপ ও বিহার নির্মাণ এবং প্রচারক প্রেরণ করিয়া তিনি এই ধর্মের বহুল প্রচারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন । কণিকের রাজত্বকালে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ।

পার্শ্বব নামক এক স্থবিরের নিকট কণিক অবসর সময়ে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । নানাদলের নানাপ্রকার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক সময়ে সম্রাট হতবুদ্ধি হইতেন । সম্রাট

শ্রবিরকে জানাইলেন যে, ধর্মশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। সম্রাটের এই অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত ^{3rd Convention.} এক মহাসভা আহূত হয়। শ্রবির বসুমিত্র এই সভার সভাপতি এবং বুদ্ধচরিত-প্রণেতা অশ্বঘোষ সহকারী সভাপতি রূত হইয়াছিলেন। অনেকদিন এই মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাশ্মীরের কুন্দল বনবিহার, পরে জালন্ধরের কুবল সঙ্ঘারামে মহা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মূল বৌদ্ধশাস্ত্র অবলম্বনে উপদেশ, বিভাগ, অভিধর্মবিভাগ নামক তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংস্কৃতে সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থত্রয়ই মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের উভয় শাখার মধ্যে ব্যবধান বর্ধিত হইল। উভয়ের ধর্মশাস্ত্র মূলতঃ এক হইলেও বস্তুত পৃথক হইল। উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধও নামে এক হইলেও যথার্থতঃ এক নহেন। হীনযানীয় বুদ্ধ মহাপুরুষ, নরসিংহ কিন্তু মহাযানীয় বুদ্ধ দেবতা, শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের হৃদয় হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধধর্মের আদিম বৃত্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষোভের কোনো কারণ নাই। বীজ হইতেই বনস্পতির উদ্ভব, বনস্পতির সহিত বাঁজের আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও উহা বীজেরই সার্থক পরিণতি।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীনের এক সম্রাট বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তখন হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়া

থাকিবে। খৃষ্টের প্রথম শতকে কুশান নরপতি কণিকের শাসন-কালে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনে এই ধর্ম প্রচার করেন। সেই সময়ে চীনে হ্যানবংশীয় সম্রাট্ মিংতি রাজত্ব করিতে-ছিলেন। পিকিঙ্ নগর হইতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণপূর্বের তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজধানী হেনান নগরেই সর্বপ্রথমে বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। হেনান নগর হেনানপ্রদেশের রাজধানী। এখন এই প্রদেশের লোক-সংখ্যা প্রায় ২৥ কোটি।

সম্রাট্ মিংতি পেশোয়ারে সম্রাট্ কনিকের রাজসভায় সাই-ইন (Tsai yin) নামক এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ নামক দুই জন বৌদ্ধসাধু ইহার সহিত চীন দেশে গমন করেন। ইহাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল। এক শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে ঐ গ্রন্থরাজি বাহিত হইয়াছিল। ঐ শ্বেত অশ্বের মৃত্যু হইলে হেনান নগরে যে স্থানে উহাকে সমাধিস্থ করা হয় সেই স্থানে এক প্যাগোডা (মন্দির) নির্মিত হইয়াছে। উহার নাম পাই-মা-জু বা শ্বেতাশ্ব মন্দির।

এই সময় হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতে থাকে। তখন হইতে খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত হেনানে সকল সময়ে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প আদৃত হইতেছিল।

খ্রীষ্টের তৃতীয় শতকে উ-তি চীন সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে বোধি-ধর্ম নামক এক ভারতীয় ভিক্ষু হেনানে

গমন করিয়া ধ্যান-তত্ত্ব প্রচার করেন। হেনানের নিকটবর্তী স্ফুশান পাহাড়ে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির আছে। তথাকার শাওলিংজু নামক মন্দিরে ভিক্ষু বোধিধর্ম্ম নয় বৎসরকাল ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সম্রাট্ তাই-সুঙ্ রাজত্ব করিতেন। তিনি হেনান নগরে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় নানাশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইত। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ভারতের ধর্ম্ম ও ভারতের সভ্যতা সমগ্র চীনে এবং কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের সহিত ভারতের আদান-প্রদানের যোগ বিশেষভাবে ছিল। সম্রাট্ তাই-সুঙের শাসনকালে চীনাভিক্ষু উয়ান-চুয়াঙ্ ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। উয়ান-চুয়াঙ্ হেনানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পরে ই-চিঙ্ ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে তখন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী চীনারা স্বর্গ-ভূমি বলিয়া মনে করিতেন। ই-চিঙ্ এই স্বর্গে ২৫ বৎসর বাস করিয়া স্বদেশে গমন করেন। এই সময় হইতে প্রায় ছয়শত বৎসর কাল চীনা নরনারীর সমগ্র জীবনে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জাপানের ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহা অসংশয়ে বলা যায় না। মোটামুটি ইহা বলা যায় যে, খৃষ্টের

ষষ্ঠ শতকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে আজ পর্যন্ত জাপানে সংস্কৃত নানাশাস্ত্র আলোচিত হইতেছে। জাপানে এখনও বৌদ্ধদের পরিচালিত সাতটি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ষষ্ঠের সপ্তম শতকে বিখ্যাত চীনা ভারত-ভ্রমণকারী উয়ান-চুয়াঙ্ ও তাঁহার কতিপয় পণ্ডিতশিষ্য চীনের “বৌদ্ধ অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানে” অধ্যাপকতা করিতেন। কয়েকজন জাপানী পুরোহিত ইহাদের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। ৭৩৫ অব্দে বোধিসেন অপর এক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুসহ জাপানে গমন করেন। এই সময় হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল।

চীন হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সেখানে কালক্রমে ঐ ধর্ম বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে “দাই-নিচি” সম্প্রদায় বিশেষ বিখ্যাত। জাপানের পুরাণে সূর্য্যদেবতার নাম ‘দাই-নিচি। ‘দাই’ অর্থ মহৎ আর ‘নিচি’ অর্থ সূর্য্য। প্রথমে এই সম্প্রদায়ের উপাস্ত্র বুদ্ধের নাম ছিল “শ্রীমহাবৈরোচন তথাগত।” অতঃপর এই নাম পরিবর্তিত হইয়া “বিরুশানো নিয়োরাই” হয়। নিয়োরাই অর্থ উপশম। জাপানীরা তথাগতের বদলে ইহা ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে এই আধা সংস্কৃত আধা জাপানী নাম পুরাপুরি জাপানী হইয়া—“দাইনিচি নিয়োরাই” নাম পরিগ্রহ করিল।

কেহ কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই স্বয়ং শাক্যমুনি ।
আবার কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই আসল বুদ্ধ—বুদ্ধের
নিয়ম মূর্তি । তিনি সমস্ত ভূতের হেতু ও কর্তা এবং শাক্যমুনি
ঐহার অবতার—গুণময় ব্যক্তি মাত্র ।

জাপানী তাইজো-কাই বুদ্ধের পদ্মাসনের পাপড়িতে “অ”
এবং কক্কোকাই বুদ্ধের পদ্মের পাপড়িতে “বং” লেখা থাকে ।
এই দুইটি অক্ষরের রূপ অবিকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরের
ন্যায় । কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল;
অক্ষর জাপানে পূজিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহা ভাবিলেও
বাঙ্গালীর গর্বি ও আনন্দ হইবার কথা ।

রেইসেন (Raisen) নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত
৮০৪ অব্দে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার “বৌদ্ধ-
অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের” অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন । প্রাজ্ঞ নামক জনৈক
ভারতীয় ভিক্ষুর সহিত একযোগে তিনি একটি বৌদ্ধ সূত্রের
অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন । এই গ্রন্থের জাপানী নাম “শিঞ্চি কো
আঙ্গো ।” ইহা এখনও জাপানী বৌদ্ধদের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ।
জাপান সেই পুরাকালেই ভারতের ধর্ম ও ভারতের সভ্যতা গ্রহণ
করিয়াছিলেন । সেই প্রাচীনকালে জাপানীসম্রাট্ সাগার পুত্র
কুমার তাকাওকা জাপানী হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়া-
ছিলেন । পথিমধ্যে কোচিন-চীনের অন্তর্গত লাওস নামক স্থানে
রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ।

খৃষ্টীয় ৩৭২ অব্দে চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় প্রচারিত

হয়। চীন হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম কো-চীন, ফরমোজা, মোঙ্গলিয়া এবং অপর নানারাজ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের পরে অল্পকাল মধ্যেই ঐ ধর্ম নেপালে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে এই ধর্ম তথাকার রাজকীয় ধর্মে পরিণত হয় নাই। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধরাজ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ-সংগ্রহার্থ নেপালে লোক পাঠাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের সকল রাজ্যে এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের কোনো কোনো দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। চীন ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম এখনও রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে রহিয়াছে। কিন্তু একই দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্মের উদারনীতি ও মৈত্রী একসময়ে যে আলোক-ছটার বিকাশ করিয়াছিল, সেই আলোকে সমস্ত এশিয়া মহাদেশ আলোকিত হইয়াছিল। এই ধর্ম যে, এশিয়া মহাদেশে সত্যতার বিকাশে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টধর্মের উপর নানাপ্রকারে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনার সহিত বীশুর জীবনের ঘটনার ঐক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের বহুসংখ্যক হিতোপাখ্যান ও উপদেশ বীশুর হিতোপাখ্যান ও উপদেশের সহিত অভিন্ন। কোনো কোনো খৃষ্টান ধর্মযাজক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টধর্ম হইতে ঐ সকল গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বীশুর জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্মপ্রচারকগণ ঐ সকল দেশে বসতিস্থাপন করায় শক্তিশালী বৌদ্ধ সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার “থেরাপিউটস্” (Therapeuts) এবং পালেস্তাইনে “এসেনেস” (Essenes) নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্প্রদায় সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিল।

সিলিং (Schelling) ও সোপেনহারের (Schopenhauer) তুল্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারাই পূর্বেক্ত দুই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্লিনির রচনা মধ্যে এই মন্তব্য দৃষ্ট হয় যে, বীশু যখন পালেস্তাইনে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন তখন এসেনেস বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথায় সর্গোরবে বিরাজ করিতেছিল। ঐ সকল বৌদ্ধ সাধু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর তুল্য চিরকৌমাৰ্য্য অবলম্বন পূর্বক মঠে বাস করিতেন। ইহাদের প্রভাব ইহুদী সমাজে নিঃসন্দেহ পতিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের সুনীতি,

সদাচার, মৈত্রী প্রভৃতি সমস্তই যীশু পরিজ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত গ্রহণ করিবেন ইহার মধ্যে বিস্ময় বা অগৌরবের কিছুই থাকিতে পারে না। বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মের অত্যুচ্ছল সাদৃশ্যগুলি যাহারা আকস্মিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অশ্রদ্ধেয়।



ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “তপোবন” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছ-পালা নদী-সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।

“ভারতবর্ষের যে দুই বড় বড় প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ—সেই দুই যুগকে বনই ধাত্তরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আশ্রয়ন, কত বেণুবনে তার উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে বৃকে করে নিয়েছিল। সেই অরণ্যবাসিনঃস্বত্বে সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।”

বস্তুতঃই বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে ভারতের তপঃক্ষেত্র হইতে সভ্যতার ধারা উৎসাকারে উৎসারিত হইয়া নিখিল ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তপোবনবাসী ঋষিদের আশ্রমে বিদ্যার্থী ধনি-দরিদ্র সকলে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতেন। ঋষি ছাত্রদিগকে অন্ন ও বিদ্যা উভয়ই দান করিতেন, আশ্রমবাসী শিষ্যগণ ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোথান করিয়া ধেনুচারণ, সমিধ, কুশ ও ফল আহরণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন ও বেদ অধ্যয়ন করিত। তখন পুস্তক ছিল না, গুরুর মুখে বেদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ উহা শিক্ষা করিত বলিয়া বেদের নাম ছিল শ্রুতি। সেই প্রাচীনকালের শিক্ষার কোন ইতিবৃত্ত নাই, তবে জাবাল, সত্যকাম, বেদ, আরুণি, উপমন্যু ও উত্ক প্রভৃতি বিদ্যার্থীদের গুরুভক্তির আখ্যানমধ্যে তদানীন্তন শিক্ষাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

পরলোকগত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় নৈমিষারণ্যকে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“শিব্রবাহিনী পুণ্যসলিলা গোমতী কঙ্কনের গ্নায় নৈমিষ কাননকে বেষ্টিত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পুরাকালে বহু ঋষি এখানে বাস করিতেন। এখানেই বেদের অধিকাংশ আরণ্যক রচিত হয়। দেশ-দেশান্তরের ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন এবং স্বদেশে গিয়া মঠ স্থাপনপূর্বক লক্ষজ্ঞান প্রচার করিতেন। এইরূপে সমগ্র ভারতে বেদবাণী প্রচারিত হইত।”

অরণ্যের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্ত্তে পরিচালিত করিত। ঋষিদের অধ্যাত্ম প্রভাবে তখন অসীম বলসম্পন্ন ভূপতিগণ কম্পিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই শিক্ষাপদ্ধতি বৌদ্ধ যুগেও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সত্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল সাধনানিরত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উখিত হইত। নির্জন গিরিগুহা এবং শাস্ত্র-সুন্দর পল্লী ও নগরোপকণ্ঠবাসী বৌদ্ধসাধুগণের বিহারগুলিই বৌদ্ধযুগের শিক্ষানিকেতন ছিল।

তক্ষশিলা

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় বিদ্যামহাপীঠ সমূহের মধ্যে প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবকালেই এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকগণ যে সময়কে বৌদ্ধ যুগ আখ্যা প্রদান করেন, তাহার পূর্ববর্ত্তী কালেই তক্ষশিলার বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তক্ষশিলা প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাওলপিণ্ডি নগরের ২০ মাইল দূরে সরইকাল নামক রেলওয়ে জংসনের অব্যবহিত উত্তর ও উত্তরপূর্বে ছয়বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংস-স্তুপ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও বিদ্যাগৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভুবনবিজয়ী

আলেকজান্ডারের জন্মের বহু পূর্বেই তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তি দিগন্তবিশ্রুত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালেই এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, জন্মেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। হয় তো ঐ কিংবদন্তীর মধ্যে তখনকার আর্য্য-অনার্য্য-বিরোধের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, অত্রত্য বিদ্যায়তন বহুশতাব্দী অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বিরাজ করিয়াছিল। ষাঁহার কূটনীতি বলে নন্দবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, মৌর্য্যভূপতি চন্দ্রগুপ্তের সেই বিশ্বস্ত মন্ত্রী চাণক্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়া যিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন সেই পাণিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র। গান্ধার রাজ্যের শালাতুর গ্রামে পাণিনির নিবাস ছিল। মগধের অন্তর্গত কুম্ভমপুর গ্রামের বর্ষনামক তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ এক অধ্যাপকের নিকটও তিনি বহুবৎসর ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

গোভরন (কেহ বলেন ধর্ম্মরক্ষ) ও মাতঙ্গ তক্ষশিলার অপর দুই প্রসিদ্ধ ছাত্র। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গুপ্ত রাজাদিগের শাসনসময়ে চীনদেশ হইতে দলে দলে ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ আগমন করিত।

পঞ্চান্বধ, অসাতমন্ত্র, বরুণ, তিলমুষ্টি প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতকে

স্থানে স্থানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলা এক-
কালে নিখিল ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল।
এখানে বিবিধ ললিত কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত।
রিসডেভিডস ও জর্জ বুলার এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,
জাতকে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও উহার পূর্ববর্তী সময়কার
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই-
রূপ বলা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তক্ষশিলা
পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে
যখন মহাবগ্ন সঙ্কলিত হইয়াছিল তখনও তক্ষশিলার গৌরব
পূর্ববৎ ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই নগর সাইথিয়ান
রাজাদের রাজধানী ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতে তক্ষশিলার নাম আছে। এইরূপ
উক্ত হইয়াছে যে, মহাবীর রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভারতের পুত্র তকের
নাম হইতে এই নগরের নাম তক্ষশিলা হইয়াছে।

তক্ষশিলাকে বৌদ্ধগণ “তক্সির” নামে অভিহিত করেন।
এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধ কোনো এক জন্মে
এইস্থলে আপনার শির দান করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।
পরিত্রাজক ফাহিয়েন এই কিংবদন্তী ব্যতীত তক্ষশিলা সম্বন্ধে
জ্ঞাতব্য অপর কোন কথা তাঁহার বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ
করেন নাই। উয়ান চুয়াঙ্‌এর ভ্রমণ-বিবরণে প্রকাশ যে, তাঁহার
ভ্রমণকালে তক্ষশিলায় অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ছিল কিন্তু তথায়
অতি অল্পসংখ্যক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ বাস করিতেন।

মারসল সাহেব তৎপ্রণীত “A Guide to Taxila” গ্রন্থে তক্ষশিলার স্তূপ ও বিহার সমূহের ধ্বংসাবশেষরাজির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তক্ষশিলা শিল্পে, ঐশ্বর্যে, ধর্ম ও বিদ্যালোচনায় এককালে নিঃসন্দেহ অতি শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—“তক্ষশিলায় যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইলে ন্যূনকল্পে দুই দিনের দরকার।”

মহাবীর আলেকজান্ডার যখন দেশজয়ার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তক্ষশিলা অধিকার করেন। সেই সময়ের গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে, তক্ষশিলা সমৃদ্ধ, জনবহুল, সুশাসিত রাজ্য ছিল। তখন ঐ দেশে বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলা ভারত সীমান্তে অবস্থিত। ঐ নগর বহুশতাব্দী কেবল ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের জ্ঞান-পিপাসুদের আশ্রয়স্থল ছিল। চীনদেশের সাহিত্যে তক্ষশিলায় উল্লেখ আছে। তথাকার এক রাজপুত্র চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় আসিয়াছিলেন। মহাবগ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবক তক্ষশিলায় এক দেশপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তক্ষশিলা আয়ুর্বেদ শিক্ষার পক্ষে অতিশয় অনুকূল ক্ষেত্র ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহাবগ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, জীবককে তাহার অধ্যাপক মহাশয় এই অনুমতি করেন—“যাও, ভূমি

কোদালি লইয়া তক্ষশিলার সকল দিকে এক যোজন মধ্যে যত গাছ গাছড়া আছে পরীক্ষা কর, যে সকল গাছ গাছড়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না সেইগুলিই লইয়া আসিও।” জীবক এইরূপ কোন গাছ গাছড়া লইয়া আসিতে পারেন নাই।

তক্ষশিলার ছাত্রদিগকে বহু বিষয় মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত। পরবর্তী কালে নালন্দা ও অপর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণ হস্তলিপি-গ্রন্থ পাঠ করিতে পাইত। যাহাতে ছাত্রগণ শিক্ষণীয় বিষয় মনে রাখিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সূত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান করা হইত।

ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর ছাত্র এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইত। এখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতের মত রাজবংশীয় এবং জীবকের মত সাধারণ লোক সমভাবেই স্থান পাইত। ভারতবর্ষের বহুরাজ্যের রাজপুত্রগণ এখানে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এখানে ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, গান্ধর্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষাদান করা হইত। মহাসূতসোম জাতকে উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলায় শত শত রাজকুমার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এই স্থলে শিক্ষা অতি উত্তম হইত। পূর্বকালে রাজকুমারগণ তাহাদের স্ব স্ব নগরেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু ভূপতিগণ তথাপি রাজকুমারদিগকে বহুদূরবর্তী তক্ষশিলায় পাঠাইতেন; কারণ এখানকার শিক্ষায় তাহাদের বৃথা অহঙ্কার চূর্ণ এবং মন উদার হইত। ইহাতে রাজকুমারগণ

শীতাতপ সহ্য করিতে শিখিতেন এবং সর্বশ্রেণীর লোকের আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইতেন।

এইখানে ছাত্রগণ প্রত্যেক বিষয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিত। ধনী ছাত্রগণ অধ্যাপককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিত। দরিদ্র ছাত্রগণ দিবারাত্র গুরুসেবা করিত।

মৌর্য-ভূপতি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া তক্ষশিলা ও পঞ্জাবের অপর সকল স্থান স্বরাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশায় অশোক তক্ষশিলার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের পুত্র কুলীম এই স্থানে বাস করিতেন। অতঃপর কুষণকুলোস্তুব কণিষ্ক এদেশের রাজা হন। তাঁহার শাসনকর্তারা এই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহাদের কতগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানি উৎকীর্ণ লিপিতে ‘তক্ষশিলা’ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তক্ষশিলা “অমন্দ্র” নামে পরিচিত ছিল। তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্বরা। এখানে অনেকগুলি নদী ও নিষ্কার আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর জন্মে। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের উত্তরপশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ। বিবিধবর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটি যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণপূর্বে অশোকনির্মিত এক গুহা আছে। নগরের উত্ত-

রাংশে অশোকনির্মিত স্তূপ রহিয়াছে। পৰ্বদিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্প ও আলোকমালায় সুশোভিত করিত।

এখানে যে সকল স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ধর্মরাজিক স্তূপ, কুলান স্তূপ, শিবকপের মন্দির, জাণ্ডিয়াল মন্দির, লালচক ও বাদলপুরের বৌদ্ধ বিহার এবং মোহরামোরাডু ও জুলিয়নের প্রসিদ্ধ স্তূপ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তক্ষশিলার এই ধ্বংসরাজির বিশালতা এই নগরের গৌরব-ময়ী পূর্বস্মৃতি দর্শকমাত্রের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়।

নালন্দা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্র ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, মহামতি অশোক মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে ত্রিশ মাইল দূরে ফল্গুনদীর তীরে এক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। নরেন্দ্র অশোকনির্মিত এই বিহার “নরেন্দ্রবিহার” নামে অভিহিত হইত। এই বিহারই পালিতাষায় নালন্দা নামে উক্ত হইত। কেহ কেহ বলেন বিহারের দক্ষিণে আম্রোছানের সরোবরে এক ‘নাগ’ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতে বিহারের নাম নালন্দা হইয়াছে। উত্তরকালে শঙ্কর ও যুদ্গল-গোমীনামক দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐ বিহারকে বর্দ্ধিত করিয়া নবভাবে নির্মিত করিয়াছিলেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুপ্রসিদ্ধ

অমুরাগী সুপণ্ডিত নাগার্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে কয়েককাল শঙ্করের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন। অতঃপর নাগার্জুন কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী সুধন্যকটক নামক স্থলে স্বয়ং এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক পাটনা জিলায় বরগাঁও গ্রামে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এককালে এইরূপ সুবৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথায় দশসহস্র ভিক্ষু ও ছাত্র বাস করিতেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রত্যেকের বাসের জন্য পৃথক পৃথক ঘর ছিল। প্রত্যেকটি ঘর দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশস্থ নৃপতিবর্গের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে এই মহাবিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সহস্র পাঁচশত দশজন অধ্যাপক পঞ্চাশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে, পাঁচশত দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ত্রিশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে এবং এক সহস্র তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক বিশ প্রকার সূত্রে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যিনি এই অধ্যাপকমণ্ডলীর উপর অধ্যক্ষতা করিতেন তাঁহাকে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত, সুতরাং অনন্যমূল্য বিদ্যাগৌরবসম্পন্ন না হইয়া কেহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা লাভ করিতে পারিতেন না। শীলভদ্রনামক বঙ্গদেশীয় এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে এই গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি সমতট প্রদেশের এক রাজার পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ এই বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া নালন্দায়

বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিহার প্রদেশে অবস্থিত হইলেও বাঙ্গালীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘নিজস্ব’ বলিয়া মনে করিতেন। এখানে বহু বাঙ্গালী অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন। তারপর বঙ্গের পালরাজ্যদিগের শাসনকালে বিহার তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। তখন তাঁহারা নালন্দা মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন।

উয়ান চুয়াঙ্ ৫ বৎসর নালন্দায় ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন —“উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এই বিহার চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে পরমরমণীয় শোভনশ্রী ধারণ করিয়াছিল, এখানে আটটি চতুষ্কোণ কক্ষ আছে, এখানকার বিহারসমূহের অভ্রভেদী উচ্চ গম্বুজ ও চূড়া প্রভাত-শিশিরে অদৃশ্য হইয়া থাকে। ইহাদের বাতায়ন হইতে বায়ুর গতি ও মেঘের খেলা এবং উচ্চ ছাদ হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।”

অত্রত্য ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্জ ও উদ্যানের শোভাদর্শনে পরিব্রাজক মোহিত হইয়াছিলেন। এখানে সরোবরসমূহের স্বচ্ছ-সলিলে নীলকমল প্রস্ফুটিত হইত, রক্তবর্ণ কুম্ভমে কনকতরু ঝলমল করিত, শ্যামল পত্র-শোভিত আত্রবৃক্ষরাজি আনন্দপ্রদ ছায়া বিস্তার করিত।

পরিব্রাজক বলেন,—“এই সময়ে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সজ্জারাম ছিল, কিন্তু নালন্দার গৃহরাজি সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে এবং উচ্চতার অপর সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার

বহন করিতেন দেশের নরপতি ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা বিদ্যার্থী হইয়া গমন করিত তাহাদিগকে কোনপ্রকার ব্যয় প্রদান করিতে হইত না। তক্ষশিলা এবং নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ছিল না কিন্তু দেশের সর্বত্রই ক্ষুদ্রবৃহৎ সঙ্ঘারামে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ভারতীয় সর্বপ্রকার দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করা হইত। এখানে শত শত সুপণ্ডিত অধ্যাপক শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন দর্শন ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত তেমন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। উয়ান চুয়াঙ্ নালন্দায় রাজকীয় মানমন্দির ও জলঘড়ি দেখিয়াছেন। তথাকার জলঘড়ি বিশুদ্ধ সময় প্রকাশ করিত।

চারুকলা ও হস্তশিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভাস্কর্য্যে, প্রতিমাচিত্রণে এবং মন্দিরের আলঙ্কারিক চিত্রকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। চারুকলার যাহারা কুশলী ছিলেন তাহারা হস্তশিল্পকে হেয় বলিয়া মনে করিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ বিহারগুলি বিদ্যালোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নালন্দা বিদ্যালয়ের খ্যাতি সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা প্রাচীন ভারতের, কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিদ্যালয় ছিল। এখানকার “রত্নোদধি” নামক গ্রন্থালায়ে হীনযান ও মহাযান এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাবতীয় গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থালায় অতিবৃহৎ

ও উচ্চতায় নয় তলা ছিল। ইহা আকারে বুদ্ধগয়া মন্দিরের তুল্য ছিল। তিব্বত দেশে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দা-মঠের অপ্ৰাপ্তবয়স্ক সাধুরা তৈরিক সাধুদিগকে অপমানিত করায় তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইয়া গ্রন্থালয় দগ্ধ করিয়া ফেলেন। এইরূপ প্রকাশ যে, কতগুলি গ্রন্থ নাকি অলৌকিক উপায়ে অগ্নিদগ্ধ হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চীনপরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্, তৎপূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে যখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তখন নালন্দা অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজিত ছিল।

অজস্তা

খৃষ্টপূর্ব্ব কোন এক শতাব্দীতে সম্ভবতঃ কতিপয় বৌদ্ধ সাধু অজস্তার পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি স্বাভাবিক গুহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সাধনার অনুকূল বলিয়া তাঁহারা তথায় বাস করিয়া নিভৃত সাধনার শাস্তি উপভোগ করিতেন। কালক্রমে ইহাদের খ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বহু বদাণ্য ব্যক্তি তখন অজস্তার গুহাখননে আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় অনেকগুলি গুহা খনিত হইল। উত্তরকালে অজস্তা ভারতের অন্যতম বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। অজস্তার অনেকগুলি গুহায় অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা বাস করিতেন।

সারনাথ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বারাণসী শিক্ষা ও ধর্মালোচনার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সকল মতাবলম্বী সাধুগণ এখানে স্ব স্ব ধর্মমতের প্রাধান্য কীর্তন করিতে আসিতেন। ভারতের হৃদপিণ্ড-তুল্য এই কেন্দ্রভূমিতে যে সত্য জয়যুক্ত হইত তাহা নিখিল ভারতের সর্বত্র অবলীলাক্রমে প্রসারিত হইয়া পড়িত। ভগবান্ বুদ্ধ বোধিলাভ করিয়া এই পুণ্যভূমিতেই তাঁহার নবধর্ম প্রচার-কল্পে আগমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বারাণসী ও তন্নিকটবর্তী সারনাথ বৌদ্ধধর্মের অন্ত্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সারনাথ যে একদিন বৌদ্ধ সাধুদের তপস্যা ও বিদ্যাদানের প্রসিদ্ধ স্থল ছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার হেতু নাই। কাহিয়েন যখন এই পুণ্যতর্থে আগমন করিয়াছিলেন তখন দেড় সহস্র বিদ্যার্থী এখানে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

বিক্রমশিলা

নালন্দার অধঃপতনের পর পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা বিদ্যায়তন জাগিয়া উঠিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্তপুরীর পুস্তকালয় হইতেই তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ হস্তলিপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল হস্তলিপি গ্রন্থ হইতেই আধুনিক সুবিস্তৃত তিব্বতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ওদন্তপুরীর গ্রন্থালয় আকারে নালন্দার গ্রন্থা-

লয়কেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের
বহু হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল। ১২০২ খৃস্টাব্দে বস্ত্রিয়ার যখন বিহার
জয় করেন তখন তাঁহার সেনাপতি এই গ্রন্থালয়ের ধ্বংস সাধন
করেন।

বৌদ্ধ বিদ্যালয়তন বিক্রমশিলা প্রাচীন মগধ রাজ্যে অবস্থিত
ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় ভূপতি
ধর্মপাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতা গোপাল পালবংশের
প্রথম রাজা। গোপাল, ভূপাল ও লোকপাল এই তিন নামেই
তিনি পরিচিত ছিলেন। কানিংহাম সাহেব বলেন, ধর্মপাল
অষ্টম শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক উয়ান
চুয়াঙ্ ও ই-চিঙ্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থ আগমন করিয়া-
ছিলেন; তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিক্রমশিলার উল্লেখ নাই।
সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিদ্যালয়তন স্থাপিত
হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে প্রকাশ, মগধ রাজ্যে গঙ্গাতটবর্তী
প্রদেশে এক প্রশস্তাগ্র উচ্চ শৈলের উপর বিক্রমশিলা বিহার
অবস্থিত। উক্ত ছয়দ্বারী বিহারের মধ্যবর্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে
আট সহস্র লোকের সম্মিলন হইতে পারিত। বিক্রমশিলা
বিহারটি যে, অতি সুশোভন ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ
তিব্বতবাসীরা এই বিহারকে আদর্শ করিয়া তাহাদের সজ্জারাম-
গুলি নির্মাণ করিয়াছে। বিক্রমশিলা বিদ্যালয়তনে যোগশাস্ত্র,

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসা এবং বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম যখন তান্ত্রিকতায় পরিণত হয় তখন বিক্রমশিলা তন্ত্রশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা এই স্থলে আগমন করিয়া বিদ্যালোচনা করিতেন। এই বিখ্যবিদ্যালয়ে ৬টি মহাবিদ্যালয় এবং ১০৮ জন অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতেরা এই বিদ্যালয়তনে দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিতেন। যে বিদ্যার্থী দ্বার-রক্ষক পণ্ডিতদিগকে বিচারে সম্মুখ করিতে না পারিতেন তিনি এই বিদ্যালয়তনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। অগুত্র কোন কোন শাস্ত্রালোচনা করিয়া যাহারা পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন তাহারাই এখানে উচ্চতর বিদ্যালয়শিক্ষার সুযোগ পাইতেন। উয়ান চুয়াঙ্ বলেন,—এই প্রকারে পরীক্ষা করিয়া ছাত্রগ্রহণের প্রথা নালন্দায়ও প্রচলিত ছিল।

ধর্মপালের রাজত্বকালে বিক্রমশিলা সজ্জারামের অধিনায়ক ছিলেন শ্রীবুদ্ধ জ্ঞানপদ। নরপতি নরপাল দীপকর শ্রীজ্ঞানপদকে বিহারের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ এই পুরোহিত মহাশয়কে ধর্মসংস্কার কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে তিব্বতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১০২৮ খৃষ্টাব্দে দীপকর তিব্বত গমন করিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বক্তিরার বিহার জয় করেন, তখন মুসলমানেরা বিক্রমশিলা ধ্বংস করে। পালবংশীয় শেষ নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের শাসনকালে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ঐ

সময়ে শাক্যশ্রী বিক্রমশিলার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি প্রাণভয়ে প্রথমে উড়িষ্যায়, পরে সেখান হইতে তিব্বতে পলায়ন করেন।

ভাগলপুর হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী পাথরঘাটা নামক স্থানে বিক্রমশিলা সজ্বরাম অবস্থিত ছিল, এইরূপ অনুমিত হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়

জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ

জ্যোতিষ

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল বিদ্যা আলোচিত হইত জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের জ্যোতিষীরা অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্মৃতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রাবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী এই সাতাশটি গ্রহমণ্ডলে চন্দ্রের পৃথিবী-প্রদক্ষিণপথকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সূর্যের কর্কট ও মকর-ক্রান্তি-প্রয়াণ প্রভৃতি তথ্য সেই অতীতকালের জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে আরও বহু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের তথ্য তাঁহারা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। বৈদিক ও বিজ্ঞানযুগের কোন জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া যায় না। এক্ষণে প্রাচীনতম যে সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাওয়া যায় সেই সমস্ত বৌদ্ধযুগেই রচিত হইয়াছিল।

হিন্দুলেখকগণের রচনামধ্যে বৌদ্ধযুগের অষ্টাদশখানি সিদ্ধান্ত বা জ্যোতিষগ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ সকলের

অধিকাংশই এক্ষণে পাওয়া যায় না। ঐ সিদ্ধান্তগুলির

নাম :—

(১)	পরাশর সিদ্ধান্ত	(১০)	মরীচি সিদ্ধান্ত
(২)	গর্গ "	(১১)	মনু "
(৩)	ব্রহ্ম "	(১২)	অঙ্গিরস "
(৪)	সূর্য্য "	(১৩)	রোমক "
(৫)	ব্যাস "	(১৪)	পুলিশ "
(৬)	বশিষ্ঠ "	(১৫)	চ্যবন "
(৭)	অত্রি "	(১৬)	যবন "
(৮)	কশ্যপ "	(১৭)	ভৃগু "
(৯)	নারদ "	(১৮)	সোম "

ঐতিহাসিক অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, পরাশর ভারতীয় জ্যোতিষীদের মধ্যে প্রাচীনতম। তারপরে গর্গ। বেদপঞ্জীমধ্যে পরাশরের নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। পরাশরতন্ত্র নামক গ্রন্থে পরাশরের উপদেশাবলী রহিয়াছে। পৌরাণিক যুগে এই পুস্তকের বিলক্ষণ আদর ছিল। বরাহমিহির পরাশর-তন্ত্র হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সকল বচন হইতে মনে হয় পরাশরের রচনা অধিকাংশ অনুষ্ঠূভে লিখিত হইয়াছিল। পরাশর লিখিয়াছেন,— “যবন বা গ্রীকগণ পশ্চিম ভারতে বাস করিতেন।” ইহা হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যবন বা গ্রীকগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেন।

গ্রীক পণ্ডিতদের সাহচর্যে ভারতীয় জ্যোতিষীরা জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জ্যোতিষী গর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্যই জ্ঞাত হইতে পারা গিয়াছে। তিনি গ্রীকদের ভারত-আক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা। তিনি গ্রীকদিগকে “য়েচ্ছ” বলিলেও ইহা লিখিয়াছেন—“যবনেরা (গ্রীক) য়েচ্ছ, কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীদের অপেক্ষা বহুগুণে সম্মানের পাত্র। তাঁহারা ঋষি।”

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির “পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা” নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেই গ্রন্থ (১) ব্রহ্মা বা পিতামহ (২) সূর্য্য বা সৌর (৩) বশিষ্ঠ (৪) রোমক এবং (৫) পুলিশ এই পঞ্চসিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভারতীয় জ্যোতিষের সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু এক্ষণে ঐ গ্রন্থ যেরূপ আকারে দৃষ্ট হয় উহার সহিত মূল গ্রন্থের কতদূর সামঞ্জস্য আছে তাহা নির্ণয় করা দুর্লভ। বরাহমিহিরের টীকাকার উৎপল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার রচনায় ছয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আধুনিক গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলির একটিও দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রহদের সংস্থান, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহ ও নক্ষত্রদের সমসূত্র সংযোগ, তাহাদের উদয়াস্ত, পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ পথের

সহিত তার মেরুদণ্ডের অবনতি, চন্দ্রের পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথের সহিত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অবনতি, এবং জ্যোতিষ আলোচনার নানাপ্রকার যন্ত্র-নির্মাণ-তথ্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঐতিহাসিক আল্ বরুনি (Alberuni) বলেন, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের রচিত। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তই লিখিয়াছেন—ঐ সিদ্ধান্ত বিষ্ণুচন্দ্র সংশোধিত করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি অতি প্রাচীন-কালের জ্যোতিষী।

আল্‌বরুনি ও ব্রহ্মগুপ্ত দুই জনেই লিখিয়াছেন যে, রোমক সিদ্ধান্ত যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম শ্রীসেন।

আল্‌বরুনি লিখিয়াছেন যে, পুলিশ সিদ্ধান্ত একখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি বলেন, পলেস (Paules) নামক এক গ্রীক পণ্ডিত উহার রচয়িতা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার উহা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন, সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যোতিষী পলাস আলেকজেন্ড্রিনাস (Alexandrinus) ঐ গ্রন্থের প্রণেতা।

উল্লিখিত পঞ্চসিদ্ধান্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির সঙ্কলন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় হিন্দুগণ গ্রীকপণ্ডিতদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের তথ্য অল্লাধিক অবগত হইলেও জ্যোতিষগণনার সূক্ষ্মতা ও যথাতথ্যে তাঁহারা তাহাদের গুরু গ্রীকপণ্ডিতদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে-সকল ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত সহৃদয়তার সহিত ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার আলোচনা করিয়াছেন এবং অপক্ষপাত-

ভাবে ভারতীয়দিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য গৌরব অর্পণ করিয়াছেন অধ্যাপক কোলব্রুক (Cole Brooke) তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত । তিনি লিখিয়াছেন—“সেই সুদূর অতীত কালেই ভারতীয় হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কেবল চন্দ্র সূর্য্য নহে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা তদনুসারে তাঁহাদের লৌকিক ও ধর্ম্মপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ভারতীয় জ্যোতিষীরা চন্দ্রের গতিবিধি গণনায় অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন । চন্দ্রের পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা নক্ষত্রপুঞ্জকে সাতাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণপথ খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ অব্দে মহাকাব্যযুগে নির্ণীত হইয়াছিল ।”

বেদে যেমন অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের বন্দনাগান আছে, সেইরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্তবস্ততি রহিয়াছে । লোকে গগনমণ্ডলের এই জ্যোতিষ্কদিগকে ধর্ম্মভাবে অভিভূত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত । সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি তদানীন্তন জ্যোতিষীদের বিশেষ পরিচিত ছিল । লৌকিক ও ধর্ম্মপঞ্জিকায় চন্দ্র সূর্য্যের মত বৃহস্পতির গতিবিধিরও উল্লেখ আছে ।

পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে আমরা সেই কক্ষপথে সূর্য্যকে ভ্রমণ করিতে দেখি । এই পথটিকে রাশিচক্র বলে । গ্রীক জ্যোতিষীদের অনুসরণে ভারতের জ্যোতিষীরা

রাশিচক্রকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্ধ্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকগণ ভারতইতিহাসের যে যুগকে “পৌরাণিক” আখ্যা প্রদান করিতেছেন সেই যুগে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধসংঘের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল, কিন্তু তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পাশাপাশি মিত্রভাবে বাস করিতেছিলেন। বরাহমিহির পৌরাণিক যুগের জ্যোতিষী। তৎপ্রণীত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থ ডাক্তার কারন্ সম্পাদন করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় ব্রহ্মা, ইস্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সহিত ভগবান্ বুদ্ধের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ, গোলপাদ এই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। আর্য্যভট্ট সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—“পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করিতেছে।” চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণের যথার্থ কারণও তিনি বিবৃত করিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন “নদীপথে আমরা যখন নৌকাযোগে চলিতে থাকি তখন যে রূপ দেখি যে, তীরস্থ বৃক্ষগুলি বিপরীত দিকে চলিতেছে আকাশের নক্ষত্রগুলির গতি ঐরূপ।”

আর্য্যভট্ট চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই যুক্তি সুধী-সমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রঘুবংশ কাব্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের ৪০এর শ্লোকে

কালিদাস এক উপমামধ্যে বলিয়াছেন—“যাহা বস্তুতঃ পৃথিবীর ছায়া লোকে তাহাকেই অকলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া থাকে।” আর্য্যভট্টের গোলপাদে মেঘবৃষাদি দ্বাদশ রাশিচক্রের নাম রহিয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থে পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন নির্দেশ করিয়াছেন। এই গণনাও যথার্থ পরিমাপের কাছাকাছি, সুতরাং ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

মহামতি অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা কেবল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে আবদ্ধ ছিল না।

বরাহমিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৮ অব্দে) রচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্র

ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবগত আছেন যে, সম্রাট অশোক তাঁহার সুবিদ্যুত রাজ্যের সর্ববাংশে মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধযুগে ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞা আলোচিত হইয়াও উন্নতি লাভ করিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতীয়-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চরক ও সুশ্রুত

বৌদ্ধযুগেই তাঁহাদের গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও বৌদ্ধযুগেই তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপীয় বহু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আৰ্য্যসভ্যতার আলোচনা করিয়া গ্রীকদিগকেই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের স্রষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিতে প্রচেষ্টা হইয়া থাকেন। ইহাদের এই অন্ধ সংস্কার অপক্ষপাত বিচারের বিরোধী। আধুনিক লেখকগণের চেষ্টা যাহাই হউক গ্রীকেরা কিন্তু কদাচ এমন দাবী করেন না যে, প্রাচীন সভ্যতার তাহারাই জনক।

গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ারকাস (Nearchus) বলেন—
“গ্রীক চিকিৎসকগণ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইতে পারিতেন না, কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকেরা এইরূপ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিতেন।” প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এরিয়ান (Arian) বলেন—“গ্রীকেরা অসুস্থ হইলে হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইতেন, ইহারা আশ্চর্য্য উপায়ে, এমন কি অমানুষিক উপায়ে চিকিৎসা-সাধ্য সমস্ত রোগই আরোগ্য করিয়া দিতেন।”

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীসের ডিওসকরাইডিস (Dioscorides) একখানি ভেষজ পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার এই পুস্তকেই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৩৭ অব্দে লণ্ডন নগরস্থ কিংস কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রয়লি (Dr. Royle) হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব

আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ডিওস্করাইডিসের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত গ্রীক গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ববর্তী প্রাচীন হিন্দুগণের চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে বহু তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দেও ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা হইত কিন্তু তখনকার আলোচনার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সমগ্র চিকিৎসা-বিদ্যা “আয়ুর্বেদ” নামে উক্ত হইত। ডাক্তার উইলসন এই বিষয় আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—“সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র শলা, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদ, রসায়ন, বাঙীকরণ এই আটভাগে বিভক্ত ছিল।

বৌদ্ধযুগে অপর সকল বিজ্ঞানের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এই যুগে চরক ও সুশ্রুত তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অল রসিদের শাসনকালে আরবে উক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ হইয়াছিল। ঐ অনুবাদের সাহায্যে হিন্দু চিকিৎসা-বিদ্যার বিবরণ ইয়ু-পে প্রচারিত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক

জীব যতদিন মুক্তিলাভ না করে ততদিন তাহাকে বারংবার নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ উক্ত হইয়াছে ভগবান্‌ বুদ্ধ নির্বাণলাভের পূর্বে ৫৫৫ বার নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ যখন মহাবোধি লাভ করেন তখন তিনি এমন অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে কতবার জন্মিয়াছেন, কোথায় জন্মিয়াছেন, কি প্রকারে তিনি মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন সমস্তই তাঁহার দিব্য-দৃষ্টির গোচর হইয়াছিল। তিনি যখন লোকহিতার্থ সাধারণের নিকট তাঁহার কল্যাণকর সঙ্কল্প ব্যাখ্যা করিতেন তখন অনেক সময়ে আপনার পূর্বজীবনের আখ্যান বিবৃত করিয়া লোকের মনে ধর্ম ও সুনীতিমূলক উপদেশ মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

জাতকের আখ্যানগুলির বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ বুদ্ধ। স্তুরাং ঐ আখ্যানোক্ত ঘটনাগুলি যে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেও ঘটিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জাতকের আলোচনা করিয়া সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক রিসডেভিডস্‌ ও জর্জ বুলার প্রভৃতি সুধীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, জাতকগুলির মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাবকালের এবং তাহার



বোধিসত্ত্ব

অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে উত্তরভারতে সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় “জাতক ও অবদান” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—“পালি-ভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে অর্থাৎ ভগাবন্ বুদ্ধ আপনার ৫৫৫টি পূর্ব জন্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সে খানি আৰ্য্যশূরের প্রণীত। ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই পুস্তক হীনষানের কি মহাষানের বলিতে পারা যায় না। কেন না হীনষানের লোকেও সংস্কৃত লিখিত। মহাষানের লোকের কিন্তু জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়ে তখন উহার নাম হয় বোধিসত্ত্বাবদানমালা। মহাযানীরা আৰ্য্যশূরের জাতকমালা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। মহাযানে তাহার নাম বোধিসত্ত্বাবদান বা বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলে মনে হইবে যে, মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উহারা জাতকের স্থলে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন।”

দান, শীল, প্রজ্ঞা, মৈত্রী প্রভৃতি পারমিতা সমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই বৌদ্ধজাতকসমূহের উদ্দেশ্য। রায় সাহেব ঈশান-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—“বোধিসত্ত্ব কোনো জন্মে দান, কোনো জন্মে শীল,

কোনো জন্মে প্রজ্ঞা, কোনো জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে তিনি অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ-শিষ্যগণও স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুন তাহা হইলে তাহারাও জন্মজন্মান্তরে উন্নতিলাভ করিয়া শেষে নির্বাণলাভ করিতে পারিবেন। সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের উদ্দেশ্য।”

জাতকের পাঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক জাতকেরই তিনটি অংশ আছে। গৌতম বুদ্ধ কি জন্ম, কোন প্রসঙ্গে আখ্যান বিবৃত করিয়াছেন জাতকের ভূমিকা অংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে বর্তমান কথা বলা হয়। দ্বিতীয় অংশে মূল জাতক বিবৃত হইয়াছে ইহাকে অতীত বস্তু বলা হয়। তৃতীয় অংশে অতীত ঘটনায় সহিত বর্তমানের মিল দেখাইয়া “সমবধান” করা হইয়াছে।

রিসডেভিড্‌স তাঁহার বৌদ্ধ ভারত গ্রন্থে জাতকের ভূমিকা-ভাগ, আখ্যানঅংশ ও সমবধান বুঝাইয়া দিবার জন্য “শ্রোগোধ-মৃগ জাতক” সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রোগোধ-মৃগজাতকের ভূমিকাভাগ অর্থাৎ বর্তমান কথা এইরূপ :—শুগবান্ বুদ্ধ জেতবনে স্ববির কুমার কাশ্যপের জননা-সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। কুমার কাশ্যপের মাতা রাজগৃহের কোনো ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। শৈশব হইতেই তিনি ভোগ-নিষ্পৃহ ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্যানুরাগ

বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি মাতাপিতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষিণী হইলেন, কিন্তু জনকজননী তাহাদের একমাত্র সম্মানের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বালিকাকে বিবাহ দিলেন। তাঁহার রূপেণ্ড্রাণে পতিগৃহে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না।

এক উৎসবদিনে সকলে যখন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়াছিল তখন শ্রেষ্ঠিকণ্যা সামান্য বেশেই ছিলেন। স্বামী ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বালিকা বলিলেন, এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহা দুঃখের আকর। স্বামী বলিলেন—তুমি যদি দেহকে এমন দোষ-যুক্ত মনে কর তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন? স্ত্রী বলিলেন—স্বামিন্, আপনার অনুমতি পাইলে আজই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রেষ্ঠিকণ্যা দেবদত্তের স্থাপিত ভিক্ষুণীনিবাসে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু এই কণ্যা যে দিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেই দিনই সসঙ্গ ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বামী কিংবা তিনি জানিতেন না। ক্রমে তাঁহার যখন গৰ্ভলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল তখন দেবদত্ত বিনা অনুসন্ধানে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠিকণ্যা জেতবন বিহারে ভগবান্ বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন।

তথাগত শ্রেষ্ঠিকণ্যাকে শুদ্ধচরিত্রা বুদ্ধিতে পারিয়াও তাহার হিতার্থে এক সভার আয়োজন করিলেন। সভায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা সকলে সমবেত হইলেন। ভগবান্ বুদ্ধের মিদেহক্রমে স্থবির উপালি সভা স্থানে শ্রেষ্ঠিকণ্যার বিবরণ

বিবৃত করেন। উপালির আদেশে উপাসিকা বিশাখা যবনিকার অস্তুরালে গমন করিয়া কন্যার সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া সর্বজন সমক্ষে ইহা ব্যক্ত করেন যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের উপাশ্রয়ে এই কন্যা যথাকালে এক পুত্র প্রসব করেন। রাজা প্রসেনজিত এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গিয়া পুত্রবৎ পালন করেন। এইজন্ম শিশু “কুমার কাশ্যপ” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

একদিন সায়ংকালে জেতবনে ভিক্ষুগণ এই প্রসঙ্গে দেব-ব্রতের নিষ্ঠুরতা এবং পরমকারুণিক বুদ্ধের সুবিচার ও দয়ার কথা বলাবলি করিতেছিলেন। তখন ভগবান্ বুদ্ধ বলেন,— অতীত জন্মেও দেবদত্ত কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর সর্বনাশ সাধনে উচ্চত হইয়াছিলেন, তখনও আমি ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলাম।

অতঃপর ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদের অবগতির জন্ম তাঁহার পূর্ববর্তী কোন এক জন্মের একটি আখ্যান বিবৃত করেন। উহাই জাতকের মূল অংশ বা অতীত বস্তু। “শ্ৰোগোধ মৃগ জাতকের” এই অংশ এইরূপ :—

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসী রাজ্যে রাজত্ব করিতেন তখন বোধিসত্ত্ব তথায় হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হরিণের গায়ের রং সোনার মত, শৃঙ্গের রং রূপার মত, এবং চক্ষু দুইটি মণির মত উজ্জ্বল ছিল। এই হরিণ “শ্ৰোগোধমৃগ-রাজ” নামে উক্ত হইতেন। তিনি পাঁচশত সঙ্গিসহ অরণ্যে বিচরণ

করিতেন। নিকটে আরও একটি সোনার বর্ণ হরিণ ইহার মত পঞ্চশত অনুচরসহ বিচরণ করিত। সেই হরিণের নাম ছিল “শাখামৃগ”।

রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগমাংস প্রিয় ছিলেন। তাঁহার জন্য প্রত্যহ মৃগ বধ করিতে হইত। নগর ও জনপদবাসীরা মৃগ সংগ্রহের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বনের সমস্ত হরিণ তাড়াইয়া রাজার উদ্যান মৃগ-পূর্ণ করিয়া দিল। রাজা উদ্যানে গমন করিয়া শত শত হরিণ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি ঞ্চোগ্রোধমৃগরাজ এবং শাখামৃগের আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

অতঃপর প্রত্যেক দিন উদ্যানের এক একটি মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করা হইত। ইহাতে সমস্ত মৃগগুলি ভীত এবং কোন কোন মৃগ আহত হইয়া ছুটাছুটি করিত। বোধিসত্ত্ব শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাহাদের দুই দল হইতে পালাক্রমে এক একটি হরিণ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজার পাচক সেই মৃগকে বধ করিবে।

অনন্তর একদিন এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে দলপতি শাখামৃগকে গিয়া বলিল—“আমি সসভা আমাকে ছাড়িয়া দিবার অনুমতি করুন।” শাখামৃগ বলিল—“ইহা তোমার অদৃষ্টির ফল, আমি তোমার পালা অন্যের স্বন্ধে চাপাইতে পারিব না।” অনন্যোপায় হইয়া সেই হরিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গেল। সমস্ত কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন—

তুমি স্বীয় দলে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি।

যথাসময়ে পাচক ধর্মগণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পাচক জানিত, রাজা এই যুগরাজকে অভয় দিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে এই সংবাদ দিল। পাত্রমিত্রসহ রাজা সেখানে আসিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রশ্ন করিলেন,—যুগরাজ, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াছি, তবে কেন তুমি গণ্ডিকায় মাথা দিয়াছ? বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, মহারাজ, আজ যে যুগীর পাল্লা ছিল, সে সসত্ত্বা, তাহার প্রাণ রক্ষার্থ আমি অন্যের প্রাণ নাশ করিতে পারি না, সেই জন্য নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব স্থির করিয়াছি।

রাজা কহিলেন,—যুগরাজ, আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও করুণার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, আপনি উঠুন, আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই যুগীকে অভয় দিলাম।

যুগরাজ বলিলেন—ইহাতে কেবল দুইটি যুগ অভয় পাইল। রাজনু, অন্য যুগদের ক্ষাগ্যে কি হইবে?

“তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।”

“আপনার উদ্যানবাসী যুগেরা অভয় পাইল, কিন্তু অপর যুগদের দশা কি হইবে?”

“তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।”



৩৫. গ্রীষ্ম যুগ জাতকের অখ্যান

“মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, অপর চতুষ্পদ জীবের ভাগ্যে কি ঘটিবে ?”

“তাহাদিগকেও অভয় দিলাম ।”

“চতুষ্পদ প্রাণীরা অভয় পাইল, কিন্তু পাখীদের কি দশা হইবে ?”

“পাখীদিগকেও অভয় দিলাম ।”

“পাখীরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্য ও অন্ত জলচরদের দশা কি হইবে ?”

“মাছ ও অন্ত জলচরদিগকে অভয় দিলাম ।”

এইরূপে সকল প্রাণীর জন্য অভয় আদায় করিয়া বোধিসত্ত্ব গণ্ডিকা হইতে মাথা তুলিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন ।

গ ভনী হরিণী যথাকালে একটি পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল । এই শাবক বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলিতে যাইত । তখন মাতা তাহাকে এই উপদেশ দিতেন,—তুমি শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না, তুমি এখন হইতেই শৃগোধমৃগের দলে মিশিবে ।

আখ্যান শেষ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ এই বলিয়া বস্ত্রব্যের ‘সমবধান’ করিলেন—দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ, তাহার শিষ্যগণ শাখামৃগের অনুচর সকল, এই ভিক্ষুণী ছিলেন হরিণী, কুমার কাশ্যপ তাঁহার শাবক, তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং অ আমি ছিলাম শৃগোধমৃগ ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকগণ জাতকের প্রকৃতি এবং উহার বিভিন্ন অংশের ধারণা করিতে পারিবেন। জাতকের ভূমিকা মূল জাতকের অপ্রধান অংশ বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

জাতকের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিব্বত দেশের বৃহৎ জাতকমালায় ৫৬৫টি জাতক বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাপক ফোস্‌বোল মহোদয় প্রণীত ‘জাতকার্থবর্ণনা’ নামক পালি গ্রন্থে জাতক সংখ্যা ৫৪৭।

জাতকের প্রাচীনত্বের কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক রিসডেভিডস্ প্রমুখ সুধীগণ বলেন—“সমস্ত জাতক এক সময়ে রচিত হয় নাই।” রচনার পার্থক্য, মূল জাতকের গাথাসমূহের ভাষাগত প্রভেদ প্রভৃতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জাতকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছে। বিনয় পিটক ও সূত্র পিটকের মধ্যে কতগুলি জাতক সন্নিবেশিত আছে। বৌদ্ধগণ বলেন—ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পরে সপ্তপর্ণী গুহায় যে মহাসঙ্ঘীতির অধিবেশন হইয়াছিল সেই সভায় ত্রিপিটক সঙ্কলন করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় অনেক পণ্ডিত মনে করেন, খৃষ্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে বৈশালী নগরে যে মহাসঙ্ঘীতির অধিবেশন হয় ত্রিপিটক সেই সভায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ করিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্বে জাতক-গুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতকবর্ণিত আখ্যানগুলি

অস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিচয় প্রদান করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রিসডেভিডস্ বলেন—নন্দ ও মৌর্য ভূপতিগণের শাসনকালে পাটলীপুত্র নিখিল ভারতের রাজধানী হইয়াছিল। জাতকে নন্দ ও মৌর্য বংশের কিংবা পাটলীপুত্রের নাম দৃষ্ট হয় না। মৌর্য ভূপতিগণ নিখিল ভারতব্যাপী যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জাতক সেই রাজ্যের উল্লেখ করে নাই। জাতক-আখ্যানে মদ্র, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী, বিদর্ভ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যবর্ণিত রাজ্যসমূহের নৃপতিদের উল্লেখ রহিয়াছে। অন্ধ্র, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ নাই।

জাতক আখ্যানে কোন বিশিষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রাধান্য কীর্তিত হয় নাই, কিন্তু বহু জাতকে তক্ষশিলা বিদ্যায়তনের বিশিষ্টতা বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ যুবক ও রাজপুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলায় গমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই স্থান ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল ইহা একরূপ সুনিশ্চিত।

জাতক-আখ্যানে যে সময়ের বর্ণনা করা হইয়াছে তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলি খণ্ড-ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। “উলুক” জাতকে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির প্রথম কল্পে মানুষেরা সমবেত হইয়া এক স্ত্রী, সুলক্ষণযুক্ত, পরম সুন্দর পুরুষকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে রাজপদ

বংশানুগ ছিল না। যিনি যোগ্য বিবেচিত হইতেন তিনিই দল বা সম্প্রদায়ের নেতা বৃত্ত হইতেন। তবে কালক্রমে রাজপদ বংশানুগ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু অনেক স্থলে রাজার অভিষেক সময়ে প্রজা ও অমাত্যগণের মত গ্রহণ করা হইত। “পাদাঞ্জলি” জাতকে দেখা যায় যে, বিষ্ণু মন্ত্রীদেব বিচারে বারাগসীরাজ ব্রহ্মদত্তের জড়মতি ও আলম্বপরতন্ত্র পুত্র পাদাঞ্জলি রাজপদের অযোগ্য বিবেচিত হইলেন এবং ঐ স্থলে রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য বোধিসত্ত্ব রাজপদ প্রাপ্ত হন। “গ্রামগী-চণ্ড” জাতকে উক্ত হইয়াছে যে, বারাগসীরাজ জনসঙ্ঘের মৃত্যু হইলে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র আদর্শকুমারকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এইরূপ আখ্যান হইতে ইহা বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে, সর্বত্র না হইলেও, স্থানে স্থানে রাজার অভিষেকে লোকমত ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতি গ্রহণ করা হইত।

লোকভয় ও ধর্ম্মভয়ই সর্বকালে শক্তিমান ব্যক্তিদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ভূপতিগণ দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্রান্তি, আর্জ্জব, মর্দব, তপঃ, অবিরোধন এই দশ প্রকার গুণ-ভূষিত হইতেন। যে সকল রাজা এইরূপ সদগুণ-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা কদাচ প্রজাপীড়ন করিতেন না।

যাহারা উক্তরূপ গুণ-সম্পন্ন নহেন, এমন রাজারাও আপনা-দিগকে প্রজা সাধারণের সর্বময় প্রভু বলিয়া মনে করিতেন না।

“তৈলপাত্র” জাতকে বর্ণিত হইয়াছে, তক্ষশিলার এক রাজা কোন রূপবতী যক্ষিণীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। যক্ষিণী এই রাজাকে বিনাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মোহাবিষ্ট রাজাও যক্ষিণীর অন্তায় অনুরোধের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—“ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই। আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি। যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা দুরাচার কেবল তাহাদিগেরই দণ্ড বিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভু নহি তখন তোমাকে তাহাদের আধিপত্য কিরূপে দিব ?”

তখন দেশে স্থানে স্থানে অত্যাচারী রাজাও ছিল। “মহাপিঙ্গল” জাতকে এইরূপ এক উৎপীড়ক রাজার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে কাশীরাজ মহাপিঙ্গল সেইরূপ নানা প্রকার উৎপীড়নে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন। রাজারা যখন এইরূপ অত্যাচারী হইতেন তখন সময়ে সময়ে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে বধ করিয়া নূতন রাজা নির্বাচন করিত। “সত্যংকিল” জাতকে এইরূপ এক অত্যাচারী রাজার নিধনের বিবরণ আছে। বারাণসী নগর-বাসীরা উৎপীড়ক রাজাকে বধ করিয়া বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে কিংবা তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। গৌতম বুদ্ধের পিতা শুক্কোদন

কপিলবাস্তুর রাজা ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তিনি শাক্যবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহাদের অশ্রুতম দলপতির কার্য্য করিতেন। শুদ্ধোদন বাতীত আরও বহু ব্যক্তি “রাজা” বলিয়া উক্ত হইতেন। “একপর্ণ” জাতকের বর্ত্তমান বস্তুকথায় অর্থাৎ ভূমিকাঅংশে উক্ত হইয়াছে—“বৈশালী নগরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এই নগর এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সাত হাজার সাতশত সাতজন রাজা সর্বদা ইহার শাসন কার্য্য নির্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি ও ভাণ্ডাগারিকের সংখ্যাও ঐ প্রকার ছিল।” সম্ভবতঃ বৈশালীর সমস্ত ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই “রাজা” উপাধি ছিল।

জাতকের বর্ত্তমান বস্তুকথায় বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব-কালের বহু তথ্য রহিয়াছে। তখন আর্য্যাবর্ত্তে বারাণসী, কোশম্বী, সাকেশ, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ ও চম্পা এই ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

রায় সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডে “জাতকে পুরাতত্ত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“রাজকর সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখা যায় রাজা ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করিতেন। লোকে যে সময়বিশেষে নগদ টাকা না দিয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজকরস্বরূপ দিত “কুরু-ধর্ম্ম” জাতকে তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে শস্য মাপিয়া লইতেন তাহার উপাধি ছিল “দ্রোণ-মাপক।”

“জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্ম্যানুশাসক, সর্বার্থচিন্তক, সর্বকৃত্যকার, বিনিশ্চয়ামাত্য, অর্ঘ্যকার, সেনাপতি, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রহ, অসিগ্রহ, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাতা, হিরণ্যক, সারথি, দৌবারিক, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য্য, গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক (শুরু-সংগ্রাহক), নগরগুপ্তিক, রাজবৈজ্ঞ প্রভৃতি রাজকর্মচারীর নাম আছে। এতন্মধ্যে গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক, রাজবৈজ্ঞ, নগরগুপ্তিক ব্যতীত অপর সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত হইতেন।”

“তখন পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাধারণতঃ অর্থধর্ম্যানুশাসক, সর্বার্থ-চিন্তক, সর্বকৃত্যকার, ও বিনিশ্চয়ামাত্য এই সকল মন্ত্রিপদে ব্রাহ্মণজাতীয় লোক নিযুক্ত হইতেন।”

পুরোহিতপদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল। রাজার সহিত পুরোহিতের কুলক্রমাগত প্রীতির বন্ধন থাকিত। জাতকে দুই পুরোহিতের কথা আছে। ‘পাদকুশল-মানব’ জাতকে দেখা যায় প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

পুরোহিত পদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী (Banker or Treasurer) পদও বংশানুগ ছিল। রাজকীয় শ্রেষ্ঠীরা সম্ভবতঃ রাজ্যের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্যে রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজকোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে ঋণও দিতেন। তাঁহাদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত।

“গ্রাম-ভোজক” কর্মচারীর সহিত সেকালে পল্লীবাসীদিগের

বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই কর্মচারীই পল্লীর শাস্তি রক্ষা করিতেন। দস্যুতন্ত্রের হাত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করা ইহার কর্তব্য ছিল। গ্রাম-ভোজক পল্লীবাসীদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতেন। স্থানে স্থানে এই কর্মচারী অত্যাচারী হইতেন; তখন রাজা ইহাকে কর্মচ্যুত করিতেন। “খরম্বর” জাতকে এইরূপ এক দুষ্ক রাজকর্মচারীর বিবরণ বর্ণিত আছে। ঐ কর্মচারী দস্যুদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের দ্বারা গ্রাম লুণ্ঠন করাইত। ইহার কু-কীর্তি রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন।

সেকালে রাজকর্মচারীরা পল্লীবাসীদের বিবাদের মীমাংসা করিতেন। গ্রাম-ভোজকেরাই নিম্নতম বিচারক ছিলেন। কোন ব্যক্তি উৎকট অপরাধ করিলে “বিনিশ্চয় মহামাত্র” নামধেয় কর্মচারীরা তাহার বিচার করিতেন। ইহাদের বিচারে যাহারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হইত তাহারা মুক্তি পাইত। কিন্তু যাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইত তাহাদিগকে “ব্যবহারিক” নামধারী কর্মচারীর নিকট পাঠান হইত। ব্যবহারিকদের উপর যথাক্রমে সূত্রধার, অষ্টকুলক (আটকুলের লোকদ্বারা গঠিত বিচারকদল— বর্তমান জুরীর স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা এই সমস্ত উর্দ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী ধার্য হইলে রাজারা তাহাকে প্রবেণি পুস্তক অর্থাৎ নজীরের বহির ব্যবস্থামতে দণ্ড দিতেন। রাজা ভিন্ন বোধ হয় আর কেহ প্রাণদণ্ড দিতে পারিতেন না।

রাজাকে প্রায় সকল দেশেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে করা হইত। রাজার এইরূপ সম্মান জাতকে নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। “গ্রামণীচণ্ড” জাতকে অপরাধী গেরেপ্তারর যে প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। লোকে একটা টিল বা একখানা খাপ্‌রা তুলিয়া অপরাধীকে বলিল—“ঐ দেখ রাজদূত, এস তোমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে।” অপরাধী তৎক্ষণাৎ সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে রাজ সমীপে গমন করিত। বৌদ্ধযুগে সর্বত্র রাজাকে ঠিক দেবতার মত মনে করা হইত ইহা সত্য নহে।

মহাবস্তু অবদানে মনুষ্য ও রাজপদ সৃষ্টির তথ্য বর্ণিত আছে। মনুষ্য সৃষ্টির পরে যখন ছোট বড় নানা বিষয় লইয়া মানুষের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেছিল তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল— “আইস আমরা একজন বলবান, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে এমন লোককে আমাদের ক্ষেত্র রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের জন্য দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের সম্মতি ক্রমে সে রাজা হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল “মহাসম্মত”।

রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশে চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে

বৌদ্ধ-ভারত

না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেকদিন চলিয়াছিল।
চন্দ্রকীর্তি খৃষ্টের পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন :—

“গণদাসস্ত তে গৰ্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভূতস্য কঃ”

ভূমিত লোকের দাস, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ মাহিনাই
তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি ?” *

কেবল রাষ্ট্রনীতি নহে, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায়-
বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বহুবিষয়ক কৌতূহলপূর্ণ তথ্য জাতক পূর্ণ
রহিয়াছে। “ভীমসেন”, “গুণ” ও “মদীয়ক” জাতকে উৎকৃষ্ট
বস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। গুণজাতকে উল্লেখ আছে যে, কোশল-
রাজ নারীদিগকে যে শাড়া দিয়াছিলেন তাহা এমন উত্তম যে, এক
এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা।

“শীলবান্ নাগ” ও “কাষায়” জাতকে গজদন্ত শিল্পের ;
“অসদৃশ” ও “শরভঙ্গ” জাতকে শৃঙ্গ নির্মিত দ্রব্যের ; “সূচী”
জাতকে লৌহ শিল্পের ; “কুশ” জাতকে স্বর্ণনির্মিত দ্রব্যের ;
“অনৌলচিত্ত” জাতকে কাষ্ঠশিল্পের এবং “বক্র” জাতকে প্রস্তর-
শিল্পের বর্ণনা রহিয়াছে।

জাতক পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপর সকল দেশের মত
প্রাচীন ভারতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস এবং গর্ভ-
দাস (Born Slaves) ব্যতীত আরও দুই শ্রেণীর দাস এই

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত “নারায়ণ”
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে।

দেশে ছিল। কেহ কেহ অন্নবস্ত্রের জন্য সমৃদ্ধ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিত; কেহ কেহ দস্যু ভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য শক্তিমানের দাস হইত। “বিহুর পণ্ডিত” “কুলায়ক” “নামসিদ্ধিক,” “নন্দ,” “দুরাজান” “শত্ৰুভঙ্গা”, “বিশ্বস্তর” প্রভৃতি জাতকে দাসত্ববিষয়ক নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। তখন দাসের মূল্য একশত কাষাপণের অধিক ছিল না।

নবম অধ্যায়

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

কেনো কোনো বিদেশীয় সুধী এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু লোকে কি প্রকারে তাহাদের জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে, দেশে কি প্রকারে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, কি প্রকারে সেই অর্থ সমাজ মধ্যে বিভক্ত হইতেছে এই সকল প্রশ্নের ধারাবাহিক কোনো আলোচনা দৃষ্ট হয় না ; কেবল প্রসঙ্গতঃ কোনো কোনো স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে । অধ্যাপক জিয়ার (Professor Zimmer), ডাক্তার ফিক্ (Dr. Fick) ও অধ্যাপক হপকিন্স্ (Professor Hopkins) এই বিষয়টি বেদ, মহাকাব্য ও জাতক অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন ।

মগধরাজ অজাতশত্রু একবার ভগবান্ বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

মহাত্মন, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় কি লাভ হইয়াছে ? অপর সকল লোকে যে-সকল শিল্প বা জীবিকাব্রত গ্রহণ করে তদ্বারা তাহারা কিছু-না-কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে ! এই উপায়ে তাহারা ব্যক্তিগতভাবে

সুখলাভ করিতেছে এবং পরিজনবর্গকেও সুখী করিতেছে। কিন্তু মহাত্মন, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করিলেন তদ্বারা আপনি কোন্ আশু সুফল লাভ করিলেন ?

অজ্ঞাতশত্রু তাঁহার বস্ত্রব্য মধ্যে (১) মাছত (২) অশ্বপাল (৩) সারথি (৪) ধামুকী (৫-১৩) নয় শ্রেণীর সৈন্য (১৪) দাস (১৫) পাচক (১৬) ক্ষৌর-কার (১৭) অমুচর (১৮) মোদক (১৯) মালাকর (২০) রজক (২১) তন্তুবায় (২২) বুড়ী-নির্মাতা (২৩) কুম্ভকার (২৪) কেরাণী (২৫) হিসাবলেখক এ সকল শিল্পী ও কর্মীদের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

রাজার সহিত প্রত্যহ যে-সকল শিল্পী ও কর্মীর দেখা হইতে পারে এই তালিকা মধ্যে তাহাদের নামই আছে।

প্রাচীন কালের অপর কোন কোন গ্রন্থে আঠার প্রকার শিল্পীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা যথারীতি সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া বাস করিত।

(১) সূত্রধর—ইহারা কাষ্ঠ দ্বারা কেবল বাস, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এমন নয় ; ইহারা গৃহ, নানাপ্রকার যন্ত্র ও জলযান নির্মাণ করিত।

(২) কর্মকার—ইহারা নানা ধাতু দ্বারা বিবিধ দ্রব্য নির্মাণ করিত। লৌহ দ্বারা ইহারা লাঙ্গল, কুড়ুল, নিডানি-করাত, ছুরি এবং অপর নানাপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিত।

দ্বারা সূক্ষ্ম সূচীও নির্মিত হইত। ইহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নানা দ্রব্য ও অলঙ্কার তৈয়ার করিত।

(৩) প্রস্তর শিল্পী—ইহারা ঘরের ও জলাশয়ের সোপান, কাষ্ঠনির্মিত গৃহের ভিত্তি, খোদিত স্তম্ভ, প্রস্তরের বাটী ও বাসন প্রভৃতি নির্মাণ করিত।

(৪) তন্তুবায়—ইহারা কেবল সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করিত এমন নহে; ইহারা অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র বয়ন করিয়া উহা বিদেশে চালান করিত। ইহারা অতি মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্র, নানা প্রকার কম্বল ও আসন প্রস্তুত করিত।

(৫) চর্মকার—ইহারা নানা প্রকার পাছুকা প্রস্তুত করিত। ইহারা নানা কারুকার্য-খচিত পাছুকা এবং নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ার করিত।

(৬) কুম্ভকার—ইহারা গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য থালা, বাটী, বাসন প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিত এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিত।

(৭) গজদন্ত শিল্পী—ইহারা নিত্য ব্যবহার্য নানা জিনিষ এবং বহু মূল্যবান্ কোন কোন দ্রব্য নির্মাণ করিত।

(৮) কাপড়ে রঙ করার কার্য—ঠাঁতীরা যে কাপড় তৈয়ার করিত এক শ্রেণীর শিল্পী সেই সকল কাপড় নানারঙে রঙীন করিয়া দিত।

(৯) মণিকর—ইহারা মণিমাণিক্য দ্বারা নানা আকারের

অলঙ্কার নির্মাণ করিত। শাক্যস্তুপে সেকালের বহুপ্রকারের রত্নালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।

(১০) মৎস্যজীবী—ইহারা নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিত। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কথা প্রাচীন সাহিত্যে কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

(১১) কসাই—প্রাচীন গ্রন্থে কসাইখানার উল্লেখ আছে।

(১২) ব্যাধ ও শিকারী—ইহারা বন্য প্রাণী বধ করিয়া এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত বিক্রয়ার্থ নগরে লইয়া আসিত।

(১৩) সুপকার ও মোদক—এই শ্রেণীর লোক জন-সংখ্যায় বহু ছিল।

(১৪) ক্ষেত্রকার—ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। ইহারা নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় করিত এবং ধনীদের সুশোভন শিরস্ত্রাণ সুসজ্জিত করিয়া দিত।

(১৫) মালাকর ও পুষ্প-বিক্রেতা।

(১৬) নাবিক—ইহারা বড় বড় নদী ও সমুদ্রে নৌ-চালনা করিত।

(১৭) বুড়ী-নির্মাতা।

(১৮) চিত্রকর।

এই সকল শিল্প ও কৃষিকার্য্য দ্বারাই দেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার্জন করিত। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এই দেশে জল ও স্থলপথে বণিকগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বহন করিত।

অর্থোপার্জন করিত। স্থলপথে শকটে এবং নদীপথে ও সমুদ্রের উপকূল দিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ জলযানে বাণিজ্য-সম্ভার বাহিত হইত। তখন নিশ্চিত পথ কিংবা সেতু ছিল না। পণ্যপূর্ণ শকট-মন্তরগতিতে জঙ্গল ও ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ দিয়া যাতায়াত করিত। শকটগুলি কখনও ঘণ্টায় দুই মাইলের অধিক চলিতে পারিত না।

অতি প্রাচীনকালে এই দেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান হইত। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই এই দেশে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। রৌপ্য মুদ্রা তখন ছিল না। নির্দিষ্ট ভার বিশিষ্ট ধাতু খণ্ডেই প্রধানতঃ জিনিষের মূল্য স্থির করা হইত। তখন কহাপণ বা কার্ষাপণেরই ব্যবহার ছিল। জাতকে নিক্খ (নিক্ক), সুবল্ল (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাপণ (কার্ষাপণ), কংস (কর্ষ বা কাংস), পাদ, মাসক (মাষা), কাকণিকা (কাকিণী), সিঞ্জিকা প্রভৃতি মুদ্রা কিংবা মুদ্রাবৎ ব্যবহৃত বস্তুর নাম পাওয়া যায়।

এখন বড় বড় নগরে অভাবের যে বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে কুত্রাপি তেমন অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন কোন স্বাধীন ব্যক্তি অর্থ লইয়া পরের কার্য্য করিতে প্রায়শঃ সন্মত হইত না।

তখন একদিকে যেমন তীব্র দারিদ্র্য ছিল না, অন্যদিকে তেমন অতিশয় সমৃদ্ধের সংখ্যাও অধিক হইতে পারিত না। উক্ষশিলা,

শ্রাবস্তী, কাশী, রাজগৃহ, বৈশালী, কোশম্বী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে তখন ক্রোড়পতি বণিক অতি অল্পই ছিল। তখন ভূম্যধিকারীর উপদ্রব ছিল না। সাধারণতঃ পল্লীবাসীরা আপনাদের নির্বাচিত মণ্ডলের নায়কতায় স্বীয় জমি চাষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কার্য করিয়া সুখে জীবন যাপন করিত।

স্থল-বাণিজ্য

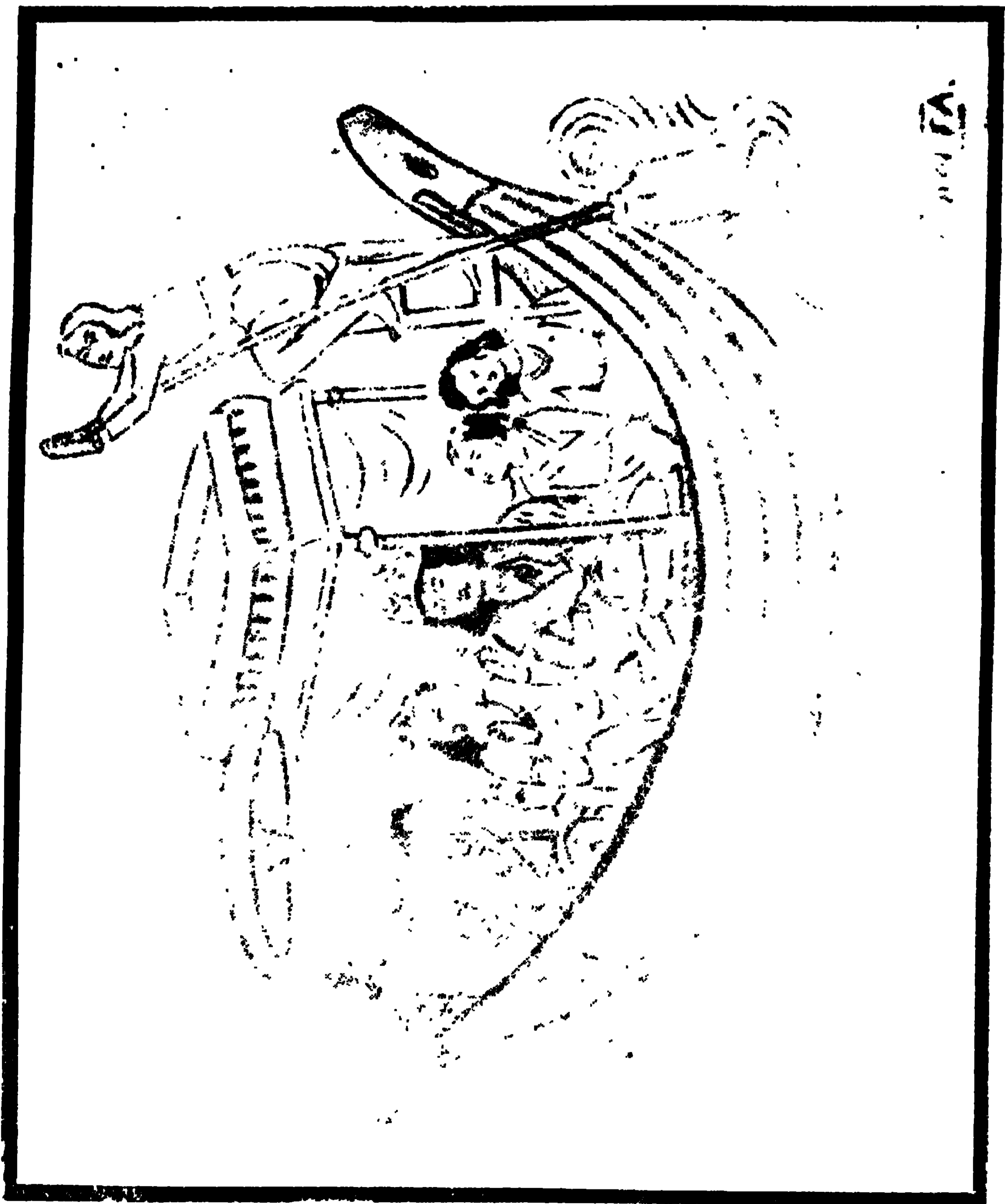
প্রাচীন ভারতে স্থল-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল গো-যান। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সেকালে সুগঠিত পথ ছিল না। পরবর্তী কালে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারকগণ দেশে দেশে গমন করিতেন তখনকার দুইটি পথের অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে বণিকেরা শ্রাবস্তীনগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করিয়া মাহিষ্যতি, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কোশম্বী ও সাকেত হইয়া পৈঠান নগরে গমন করিত। আবার তাহারা শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে কপিলবাস্তু, কুশীনগর, পাবা, হস্তিগ্রাম, বৈশালী, পাটলিপুত্র, নালন্দা হইয়া রাজগৃহে গমন করিত। এই পথে সম্ভবতঃ গয়ায়ও যাতায়াত করা হইত। তাম্রলিপ্তী হইতে বারাণসী পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল দিয়া একটি পথ ছিল। বারাণসীর বণিকেরা গো-যানে উজ্জয়িনী এবং বিদেহের বণিকেরা গান্ধার পর্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পথে দস্যুভয় ছিল। দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া কখন কখন বণিক-দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। দস্যুগণের

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিত। এই যাত্রিদলের যিনি নেতা হইতেন তাহার উপাধি ছিল “স্বার্থবাহ”। উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে ষাইবার সময়ে বণিকদিগকে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইত। রিস্‌ডেভিড্‌স্‌ বলেন—In crossing the desert west of Rajputana the caravans are said to travel only in the night and to be guided by a “Land pilot” who just as one does on the ocean, kept the right route by observing the stars. রাজপুতনার পশ্চিমদিকের মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় বণিকেরা তাহাদের শকট কেবল রাত্রিকালে চালনা করিত। তাহাদের নিযুক্ত পথ-প্রদর্শক (Land-pilot) পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। নক্ষত্র দেখিয়া সমুদ্রমধ্যে যেমন করিয়া পথ নির্ণয় করা হয়, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা হইত।

বণিকেরা যখন দীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করিত তখনও তাহারা রক্ষী নিযুক্ত করিয়া আত্মরক্ষা করিত।

অর্ণবপোত ও সমুদ্র-বাণিজ্য

সুপ্পারক, সমুদ্রবাণিজ্য, বাবেক, মহাজন প্রভৃতি বহু জাতকে সমুদ্র-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থে যে সকল সামুদ্রিক জলযানের বর্ণনা পাওয়া যায় সেইগুলি খুব বৃহৎ আয়তনের ছিল বলিয়া মনে হয়। যে



গর্ভরাকে ‘অশুভপ্রদা’ বলা হইয়াছে। বোধ করি নদীবক্ষে যাতায়াতের পক্ষে এই যানগুলি অনুকূল ছিল না।

‘বিশেষ’ শ্রেণীর যানগুলিকে প্রধানতঃ ‘দীর্ঘা’ ও ‘উন্নতা’ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ‘দীর্ঘা’ দৈর্ঘ্যের এবং ‘উন্নতা’ উচ্চতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

দীর্ঘাজাতীয় দশ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে যথা— দীর্ঘিকা, তরণী, লীলা, মন্ডরা, গামিনী, তরি, জ্জ্বলা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী। বেগিনী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য ২৫২, প্রস্থ ৩১।০, উচ্চতা ২৫। হাত। দীর্ঘাজাতীয়া যানের মধ্যে লীলা, গামিনী ও প্লাবিনী ‘অশুভপ্রদা’ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

‘উন্নতা’ জাতীয় পাঁচ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে। উর্দ্ধা, অনূর্দ্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী ও মন্ডরা। উক্ত পাঁচ প্রকার যানের মধ্যে অনূর্দ্ধা, গর্ভিণী ও মন্ডরাকে ‘নিন্দিতা’ এবং উর্দ্ধাকে ‘শুভদা’ বলা হইয়াছে।

যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে জলযানের : চিত্রণ সম্বন্ধে বহু কথা আছে। যানের কঙ্কগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয় বা ইহাদের মিশ্রদ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। চতুঃশৃঙ্গ বা চারি মাস্তুলের যান শাদাবর্ণে, ত্রিশৃঙ্গ যান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গ যান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গ যান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম ছিল। যানের মুখ বা গলুই সিংহ, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মানুষের মুখের মত করিয়া নির্মাণ করা হইত। যানের

মুখ সুবর্ণ বা মুক্তাহারে সুসজ্জিত করা ভদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত ।

যে যানগুলির কুটরী বা কক্ষ খুব বৃহৎ সেইগুলিকে ‘সর্বমন্দিরা’ বলা হইত । এই শ্রেণীর যান রাজধান, অশ্ব ও রমণী বহনের প্রশস্ত যান বলিয়া বিবেচিত হইত । আর এক শ্রেণীর যানকে ‘মধ্যমন্দিরা’ নাম দেওয়া হইয়াছে । এই যানগুলি বর্ষা ঋতুতে রাজাদের বিলাসযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত । যে যানগুলির কুটরী গলুইর দিকে থাকিত সেইগুলির নাম ছিল “অগ্রমন্দিরা” । এই যানগুলি দূরপ্রবাস যাত্রায় এবং রণে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত ।

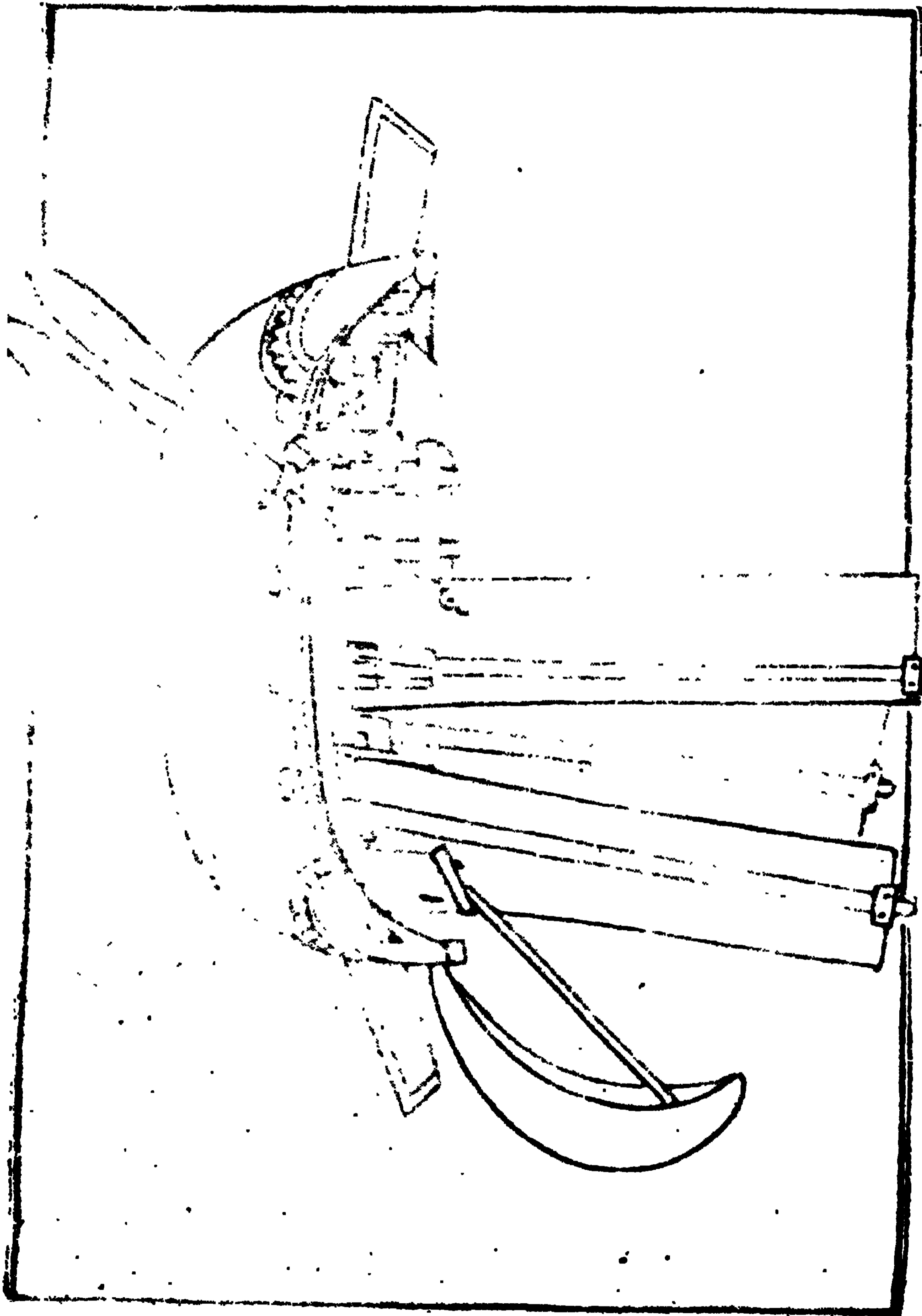
অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ভারতের বিবিধ শিল্প তথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল । তথাকার বোরোবদুর মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-খোদিত জাহাজ ও নৌ-যাত্রীর ছবি দেখা যায় । খৃষ্টের প্রথম শতকে ভারতীয়েরা কেমন করিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন উক্ত চিত্র তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয় । খৃষ্টের পঞ্চম শতকে পরিত্রাজক ফাহিয়েন একযানে সিংহল হইতে তিনমাসে যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন । খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর কোন কোন অঙ্কমুদ্রার উপরে দ্বি-শৃঙ্গ পোত অঙ্কিত আছে । ঐ পোতগুলি বৃহদাকারের ছিল বলিয়া অনুমিত হয় । ভিন্সেন্ট স্মিথ ঐ মুদ্রাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—
“কতকগুলি মুদ্রার উপর পোত অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা হইতে

মনে হয় জ্ঞানশ্রীর (:৮৪—২:৩ খৃষ্টাব্দ) প্রভুত্ব যেমন স্থল-ভাগে তেমন জলভাগেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।

সিওয়েল সাহেবের মতে ঐ সময়ে জল স্থল উভয় পথেই পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, রোম, মিশর, চীন ও অপর বহু প্রাচ্য রাজ্যের বাণিজ্যসঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল ।

ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় বণিকগণ সেই অতীত কালে তাহাদের পণ্যপূর্ণ জলযান লইয়া দ্বীপান্তরে গমন করিত । জলযানগুলি নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর (পটুন) হইতে যাত্রা করিত । বারাণসী, চম্পা, ভূগুকচ্ছ প্রভৃতি পটুন হইতে বাণিজ্য-পোত বিদেশে যাত্রা করিত । জলযানগুলি চালনা করিবার জন্য নিয়ামক (pilot) নিযুক্ত হইত । নিয়ামকগণ দিবা ভাগে সূর্য্য এবং রাত্ৰিকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিত । কদাচ প্রতিকূল বায়ুযোগে পোতগুলি সমুদ্রতীর হইতে দূরে নীত হইলে নিয়ামকগণ পোষা কাক ছাড়িয়া দিয়া কোন্ দিকে স্থল রহিয়াছে তাহা জানিয়া লইত ।

অজন্তার ২নং গুহায় নৌকা ও অর্ণব পোতের চিত্র পাওয়া গিয়াছে । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে প্রবাসী পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বলিয়াছেন—“এই যুগে ভারতবর্ষের নৌ-শক্তিও বিশেষ পুষ্টিমাত্ত করিয়াছিল । তাৎকালিক শিল্পকলাতেও তাহার আভাস পাওয়া যায় । তখন শতশত রণতরী রাজকীয় নৌ-বাহিনীর উৎকর্ষের পরিচয় দিত । এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয় পুলকেশী পূর্ব



সমুদ্রের অধীশ্বরী পুরী নগরী জয় করেন। এই সময়েই গুজরাট বন্দর হইতে দলে দলে সাহসী ব্যক্তি ভারতমহাসমুদ্রের বীচি-বিস্ক্র নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া এক অভিনব কর্মক্ষেত্র আবিষ্কারের আশায় উৎসাহাঙ্কিত হৃদয়ে অর্ণবপোত যাত্রা করেন। তারপর যবদ্বীপের কূলে উপনীত হইয়া সেই স্থানে উপনিবেশ সংগঠন কার্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

সুতরাং এই প্রবন্ধে অজস্তার নৌ-চিত্রসমূহের যে দুই খানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল ঐ চিত্রদ্বয় ঐ যুগের ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিচায়ক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রিফিথস্ সাহেবের মতেও এইগুলি প্রাচীন বাণিজ্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

They are a vivid testimony to ancient foreign trade of India অর্থাৎ এই সকল প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে অতি উপাদেয়-তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কোটিল্য বা চাণক্য ঘোর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তৎ-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের রাজ্য-শাসনপ্রণালী, ধর্ম, আচারব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। কোটিল্যপ্রণীত এই গ্রন্থখানি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূর দরবারের আনুকূলে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঞ্জোর জিলার এক পণ্ডিত এই

গ্রন্থের হস্তলিপি ১৯০৫ অব্দে মহীশূর গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

অর্থশাস্ত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় তখন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালীই প্রচলিত ছিল। কোর্টিল্যের মতে রাজা দিন ও রাত্রি উভয়কেই আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে কোন-না-কোন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। দিবাভাগে তিনি যথাক্রমে (১) প্রহরী নিয়োগ ও হিসাব পরীক্ষা, (২) নগর ও গ্রামবাসীদের আবেদন শ্রবণ, (৩) স্নান-আহার-অধ্যয়ন, (৪) রাজস্বগ্রহণ, (৫) পত্রলিখন ও গুপ্তচরদের ব্যক্তব্য শ্রবণ, (৬) বিনোদন, (৭) হস্তা, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতি পরিদর্শন, (৮) প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধকৌশল আলোচনা করিবেন।

রাত্রিকালে তিনি যথাক্রমে (১) গুপ্তচরদের ব্যক্তব্য শ্রবণ (২) স্নান, ভোজন ও অধ্যয়ন (৩) (৪) (৫) বিশ্রাম-সন্তোগ (৬) নিদ্রাভঙ্গে তিনি শাস্ত্রানুশাসন ও দিবসের কর্তব্য অনুধ্যান (৭) শাসনবিধি আলোচনা ও গুপ্তচর প্রেরণ (৮) গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিবেন।

যাঁহারা কার্যক্ষেত্রে কৰ্ম্মপটুতার পরিচয় প্রদান করেন এমন ক্ষমতাশালী সুপণ্ডিত কতিপয় ব্যক্তিকে রাজা তাঁহাদের উপদেষ্টা মন্ত্রী ও অমাত্য নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রী ও অমাত্য ব্যতীত আরও অনেক উচ্চ রাজকৰ্ম্মচারী থাকিতেন। তাহাদের এক এক জনের উপর বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার থাকিত। যিনি

রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইতেন তাঁহার উপাধি ছিল “সমাহর্ত্তা”। রাজকরের হিসাব লিখিয়া যিনি উহা রাজকোষে জমা দিতেন তিনি “সন্নিধাতা” নামে উক্ত হইতেন।

পুরোহিত অগ্ৰতম প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী ছিলেন। বিচার পর্যবেক্ষণ ও যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা তাঁহার কর্তব্য কার্য ছিল। যিনি সচ্চরিত্র, উচ্চবংশজাত, বেদ-বেদান্তে সুপণ্ডিত, রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ, যিনি অথর্ব বেদ-বিহিত ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করিয়া রাজার বিপদ নিবারণে সমর্থ এমন ব্যক্তিই প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন।

এই সকল উচ্চ কর্মচারী ব্যতীত আরও কতিপয় “অধ্যক্ষ” ছিলেন। ইহাদের কেহ খনির তত্ত্বাবধান, কেহ শিল্প-বাগিচ্যের তদন্ত, কেহ জিনিষের মূল্য নির্ধারণ, কেহ গো-শালার তত্ত্বাবধান কেহ হস্তীশালা কেহ বা অশ্বশালার তত্ত্বাবধান, কেহ বা শুল্ক আদায় করিতেন।

চোর ডাকাত ও দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিবার জন্ত রাজা দেশের সর্ববাংশে নানাশ্রেণীর গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন। কৃষক, ব্যবসায়ী ও অপর নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক গুপ্তচর নিযুক্ত হইত। শান্তিরক্ষক কর্মচারীরা চোর ডাকাত-দিগকে ধরিতে না পারিলে অপহৃত অর্থাদির জন্ত তাহারা দায়ী হইত। এই প্রকারে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত রাজা রাজকোষ হইতে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেন।

সেকালে রাজারা কৃষিকার্যের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

বৌদ্ধ-ভারত

রাখিতেন। প্রজাগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রাপ্ত হয় সরকার হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হইত। প্রজাদের কৃষি-কার্যের সুবিধার জন্য সরকার হইতে খাল কাটয়া দিবার ব্যবস্থাও ছিল। যাহারা এই প্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হইত তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের একাংশ জলকর দিতে হইত। কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ সরকারী খাসের জমি চাষ করিবার জন্য ক্রীতদাস, শ্রমিক কিংবা কয়েদীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাদিগকে ভূমিকর্ষণের জন্য বলদ, লাঙ্গল এবং অপর সকল যন্ত্র দেওয়া হইত। তখন বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে কৃষকগণ শালি, ত্রীহি, তিল, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি শস্য বপন করিত। কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কেবল শস্য নহে, নানা প্রকার পুষ্প, ফল, উদ্ভিজ্জ, মূল, তুলা এবং ভেষজরূপে ব্যবহৃত ছোট ছোট গাছ, লতা, গুল্ম প্রভৃতিরও চাষ হইত।

রাজকীয় খাস জমির উৎপন্ন, প্রজাদের প্রদত্ত রাজস্ব, বাণিজ্য-শুল্ক এবং খনির আয় এই সকলের সমষ্টিই রাজার মোট আয় ছিল। প্রজাদের জমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাজা উহার চতুর্থ কিম্বা ষষ্ঠাংশ রাজকর লইতেন। রাজ্যের সমস্ত খনি রাজার সম্পত্তি ছিল। লবণের ব্যবসায়ও তখন রাজার হস্তে ছিল। নাবালক, বিধবা ও রোগাৰ্ত্তেরা রাজার প্রতিপাল্য ছিল।

তখন রাজকীয় অনুমতিপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মোদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মধু প্রভৃতি নামধেয় মত্ত প্রস্তুত করিত।

যাহারা চরিত্রবান্ এমন লোকের নিকট সামান্য পরিমাণে মদ্য বিক্রয় করা হইত। কোন ব্যক্তি গোপনে মদ্য প্রস্তুত করিলে তাহাকে ছয় শত মুদ্রা (পূর্ণ) জরিমানা দিতে হইত।

সেকালে সমুদ্র, নদী ও হ্রদে যে সকল যান যাতায়াত করিত রাজার পোতাধ্যক্ষ কর্মচারী সেই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সকল গ্রাম সমুদ্র, হ্রদ কিংবা নদীর তীরবর্তী ছিল সেই সকল গ্রামবাসীদিগকে এক প্রকার শুল্ক দিতে হইত। ধীবর-গণ জাল বাহিয়া যে মৎস্য পাইত উহার ষষ্ঠাংশ শুল্ক দিত। প্রত্যেক বন্দরে ব্যবসায়ীদের জগ্ন নির্দ্ধারিত শুল্ক ছিল, বণিক-দিগকে ঐ শুল্ক দিতে হইত। রাজকীয় যানে যে-সকল যাত্রী যাতায়াত করিত তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মাশুল দিতে হইত। যাহারা রাজকীয় নৌকায় শঙ্খ ও মুক্তা উত্তোলন করিত তাহাদিগকে সেই নৌকার ভাড়া দিতে হইত। যে সকল বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য জল-পথে নষ্ট হইত তাহাদিগের নিকট শুল্ক আদায় করা হইত না, অথবা অর্ধ শুল্ক লওয়া হইত। যে সকল যান পোতাশ্রয়ে দাঁড়াইত ঐ সকল যানের মালিক-দিগের নিকট শুল্ক দাবী করা হইত।

সেকালে পল্লীগ্রামে পঞ্চায়েৎ শাসন প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডলেরা শান্তিরক্ষা, বিচার ও সাধারণ সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। গ্রামের প্রধান কর্মচারী 'গ্রামিক' গ্রামবাসীদের দ্বারা বোধ হয় নির্বাচিত হইতেন। কয়েকটি গ্রামের উপর "গোপ" নামে এক কর্মচারী ছিলেন। তিনি গ্রাম হইতে রাজস্ব আদায়

করিতেন এবং মানুষ ও পশু প্রভৃতির সংখ্যামূলক হিসাব রাখিতেন ।

তখন “নাগরিক” নামক এক কর্মচারী নগর শাসন করিতেন ।
নগরের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা তাঁহার হাতে ছিল ।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ শিল্প

বৌদ্ধশিল্প বৌদ্ধধর্মের উদার উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। এই শিল্পের যে নিদর্শন এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি তাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারি যে, ভারতব্যাপী এক উদার ধর্মের সমবায়ে এক সময়ে এই দেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের অসামান্য অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বেও ভারতবর্ষে চিত্রশিল্পের চর্চা ছিল। তখন শিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ-দিগের আলোচ্য। অজন্তা, সাঁচি, ভারহুত, করালী, নালন্দা, সারনাথ, গয়া প্রভৃতি নানাস্থলে এক্ষণে বৌদ্ধশিল্পের যে সকল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে সেই সকলের মধ্যে বৌদ্ধশিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। কত শিল্পী তাঁহাদের আজীবনের সাধনার দ্বারা এক একটি মন্দির বা গুহা চিত্রশোভিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াশ্বিত হইতে হয়।

ভারত-শিল্প যাঁহারা অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এই দেশের শিল্পীরা কোন বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতির হীন অনুকরণকে আপনাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার অঞ্চলতলে, যে সুষমা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন,

শিল্পী রেখাশিতে বা বর্ণভঙ্গে তাহাই দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য ভারতশিল্পের প্রধান লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। বাহিরের রূপকে ভিতরের ভাবের সহিত মিলাইয়া এবং ভিতরের ভাবকে বাহিরের রূপে ফুটাইয়া তোলাই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব। মানবজীবনের সুখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনার মধ্যে আনন্দময় দেবতার যে অনন্তলীলা হইয়া থাকে, কবি তাহা কাব্যে, শিল্পী তাহা শিল্পে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কবির ছন্দোময়ী বাণী যেমন শ্রোতার হৃদয় ভাবরসে পূর্ণ করিয়া দেয়, শিল্পীর রেখা ও বর্ণময় চিত্রও তেমন দর্শকের চিত্ত স্পন্দিত করিয়া থাকে। মহাকবির রচনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্প আমাদের আত্মা সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত করে, কেবল তাহা নহে ইহার প্রভাবে আত্মা ছন্দোময় হইয়া থাকে। এই শিল্প সীমার মন্দিরে অসীমের আনন্দ ধ্বনিত করিয়া তোলে। এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় কলাবিদ্যার বিশিষ্টতা। বঙ্গের ঋষিকল্প সুধী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

“ইহসর্ববস্তু যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদের পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তি সমূহের মূর্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর, মহত্তর, শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র।

চারুকলার উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। ভগবৎ উপলক্ষিতে এক রস, বিষয় সম্বন্ধে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের

যে কোনটি লইয়া রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরফলকে ফুটাইয়া তুলেন।

আর্টের মূলকথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ সেই সকলের মধ্যেই এক নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। এই সত্যই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ, এই জিনিষটাই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। করুণার অবতার ভগবান্ তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা মাদিরসাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্প-জগৎ হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে কেন ?

আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসিত রবিবর্ম্মার দেবদেবী মূর্ত্তিও তেমন কুৎসিত। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোনো সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতীন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও উহা যেমন হয়, শিল্পীর মৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে ছুফ্ট-দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া। তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভগবৎ সত্যকে। উলঙ্গ

নারীর চিত্র আমাদেরকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য উহাতে যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্য ভোগকে নির্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্য বিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে কোনো মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ “ইহা নয়” “ইহা নয়”। শিল্পীর কথা “ইহাই” “ইহাই”। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমন রাখিয়া ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্যে সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন, শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্বদার জগৎ ধরিয়া রাখিতে পারিলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

আর্ট হইতেছে দৃষ্টির Revelation. এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই, আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্মের লক্ষ্য আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদ্রষ্টা যদি আত্মাকে দেখিতে পাইয়া শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীর মধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে, শব্দে, বাক্যে, প্রস্তরফলকে মূর্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য করিবেন।”

হ্যাভেল সাহেব তৎপ্রসিদ্ধ Indian Sculpture and Painting নামক গ্রন্থে ভারতশিল্পের এই আধ্যাত্মিকতাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

Greek and Italian art would bring the gods to earth and make them the most beautiful of men ; Indian art raises men up to heaven and makes them as gods.

গ্রীক ও ইটালীয় শিল্প দেবতাদিগকে নরত্বদান করিয়া পরমশুন্দর মানুষরূপে চিত্রিত করিয়া থাকে ; কিন্তু ভারত-শিল্প মানুষকে দেবত্ব দান করিয়া দেবতারূপে চিত্রিত করে।

যে বীর্য আধ্যাত্মিকতার মধ্য হইতে প্রস্ফূর্ত্ত হয় না, সাধনা যে রূপকে পবিত্রতায় অভিষিক্ত করে না সেই বীর্য, সেই সৌন্দর্য ভারতশিল্পীর লক্ষ্য হইতে পারে না।

হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন :—

The ideal of manly beauty he set before him-

self was not represented by a Rajput warrior but by a divine Buddha, Krisna or Siva. His ideal of female beauty was not seen in the fairest of Indian beauty but in Parbati.

ভারতশিল্পী তাহার মানসনেত্রে শূরত্বের যে আদর্শ রক্ষা করিতেন সে আদর্শ রাজপুত্র যোদ্ধা নহে, ঐ আদর্শ ভগবান্ বুদ্ধ, কৃষ্ণ কিংবা শিব। ভারতশিল্পী এই দেশের পরমাসুন্দরী নারীকে আদর্শ নারী মনে করেন নাই, তাহার চক্ষে পার্বতীই নারীসৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ।

ভারতশিল্পের এই মহাযুগের বর্ণনা করিয়া হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন—

In the great epoch of Indian religious art which we are reviewing, art, religion and education had no existence apart from each other as they have in this age of specialisation and materialism.

অর্থাৎ বর্তমান স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যসম্পদের যুগে শিল্প, ধর্ম ও শিক্ষা সমস্তই যেমন স্বতন্ত্র, ভারতের সেই ধর্মশিল্পের মহাযুগে তেমন ছিল না। তখন ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরের সহিত অঙ্গিত ছিল।

তখন কে শিল্পচর্চা করিতেন তৎপ্রসঙ্গে হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন—

The Buddhist monks were often themselves practising artists. They used the arts, not for vulgar amusement and distraction, but as instruments for the spiritual and intellectual improvement of the people.

বৌদ্ধভিক্ষুরাই অনেক সময়ে শিল্পচর্চা করিতেন। তাহারা শিল্পকলাকে অশ্লীল আমোদ ও উন্মাদনার জন্ত ব্যবহার না করিয়া উহাকে লোকের আধ্যাত্ম ও মানসিক উন্নতি বিধানের উপায় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিল্পী প্রত্যেক চিত্রে একটি বিশেষ ভাবে মূর্তিদান করিতে চেষ্টা করেন। ভারতশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, অস্বদেশীয় শিল্পী চিত্রের সকল অংশের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চিত্রের মূল বিশেষ ভাবটিকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চান। অপ্রধান অংশগুলি তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই বাহুল্য-বর্জিত সরলতা ভারত-শিল্পের প্রাণ, অনাবশ্যক রেখাঙ্কনে, অতিরিক্ত বর্ণ-লেপনে ভারতশিল্পী তাহার চিত্র জটিল করিয়া তুলেন না। বিদেশীয় চিত্রশিল্পের বর্ণচ্ছটা যাহাদের চক্ষু বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহারা ভারতীয় শিল্পের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া এই শিল্পের নিন্দা করিয়া থাকেন।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সুসভ্য গ্রীকগণ ভারত-বর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে দুই সুসভ্য জাতির সন্মিলন হইয়াছিল। ইহার ফলে এই দুই

সুসভ্য জাতি পরস্পরের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকগণ বলেন, শিল্প-বিদ্যার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট ঋণী নহেন। গ্রীকদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তাহাদের শিল্পবিদ্যায় উন্নতিলাভ করিয়া উহার উপরে আপনাদের নিজস্ব প্রতিভার ছাপ অঙ্কন করিয়া দিয়াছিলেন। গাঙ্কার ও পাঞ্জাবে স্তম্ভশিল্পে গ্রীক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অপর কোনস্থলে গ্রীকশিল্পের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। গ্রীকশিল্পীর শিক্ষালয়ে ভারতবর্ষ যদি শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেন তাহা হইলে এইরূপ হইতে পারিত না।

পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অপর কোন স্থলে গ্রীক-ভাস্কর্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। ডাক্তার ফাণ্ডসন ভারত স্তূপের বেটনীর ভাস্কর্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন,—“এই স্থলে যে ভাস্কর্য্যবিদ্যার পরিচয় রহিয়াছে তাহা যে ভারতীয় ইহা একান্ত দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে মিশর-শিল্পের বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। এই শিল্প জটিলতা-বর্জিত। বাবিলন বা আসিরিয়ার শিল্পপ্রভাব এতন্মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এখানে স্তম্ভের মস্তকদেশে যে সকল আলঙ্কারিক কার্য্য আছে তাহার সহিত গ্রীকশিল্পের সাদৃশ্য নাই। এখানে যে শিল্প-বিদ্যার পরিচয় রহিয়াছে তাহা সর্বতোভাবে ভারতীয়দের পরি-কল্পিত এবং ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা কৃত। চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য ভারতবর্ষ বিদেশীর নিকট ঋণী নহেন; বিদেশীয়

শিল্পের যেরূপ নগণ্য নিদর্শন ভারতে দৃষ্ট হয়, ভারতশিল্পের প্রভাব এশিয়া ও ইয়ুরোপখণ্ডের নানাদেশে তদপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে।”

ভাবপরিকল্পনা বৌদ্ধশিল্পের প্রাণ। বৌদ্ধগুহার চিত্রাবলীর মধ্যে ভাবপ্রধান ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীনকালের শিল্পীরা গুহাভ্যন্তরে যে সকল নেত্রতৃপ্তিকর কারুকার্য রচনা করিয়াছেন সেই সকলের মধ্যে তাহাদের অসামান্য সহিষ্ণুতা ও শিল্পকুশলতা লক্ষ্য করিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। ভারতশিল্পের অন্ততম পীঠস্থান অজন্তার চিত্রশোভাদর্শনে আশ্চর্যান্বিতা হইয়া শিল্পানুরাগিণী, শ্রীমতী হেরিংহাম বলিয়াছেন,—“এই প্রাচীন প্রাচীর গাত্রাক্রিত চিত্রে তুলিকাপাতের যে অকুণ্ঠ ও অনায়াস ভাব প্রকটিত হইয়াছে সহস্রবৎসর পরবর্তী মোগল শিল্পকলায়ও তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা সেই সময়কার ইয়ুরোপীয় ও চীনদেশীয় চিত্রশিল্প অপেক্ষা উন্নত। চিত্র পরিকল্পনার বিরাটতা ও উদারতার নিমিত্ত অজন্তা পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন ইটালীর পুনরুজ্জীবিত শিল্পকলাই এই গৌরবের একমাত্র তুল্য অধিকারী।”

ভারতশিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, প্রভৃতির তথ্য নিহিত আছে। প্রাচীন ভারতের শিল্প সাধনার মনীষী সাধকগণ চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রেখাকরে তদানীন্তন ধর্ম ও সমাজ-চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন। রেখাকনে তাঁহারা যে

দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তেমন নৈপুণ্য আর কোন দেশের শিল্পী প্রদর্শন করিতে পারেন না। ভিন্‌সেণ্টমিথ গাঙ্কার-শিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি একান্ত অশ্রদ্ধের। গাঙ্কারশিল্পে তপস্বী বুদ্ধের যে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে উহা দেখিয়া কোন দর্শকের মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্বেক হইতে পারে না। ভারতশিল্পী পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের যে মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন সেই মূর্তির দিব্য সৌন্দর্য্য অনুপম। তাঁহার ললাট দীপ্ত, লোচনদ্বয় স্নিগ্ধ, বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, শরীর বীর্য্যশালী, তিনি পদ্মাসনে আসীন। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে

নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি ;

দৃষ্টি হতে শান্তি করে স্ফুরিছে অধর পরে

করণার সুধা হাম্বজ্যোতি ।

বিক্রমপুরে, যবদ্বীপে, সিংহলে এবং অপর নানাদেশে অবলোকিতেশ্বরের যে মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ভারতীয় ভাস্কর ব্যতীত অপর কোন দেশের ভাস্কর তেমন মূর্তি খোদিত করিতে পারেন না। বুদ্ধ পদ্মাসনে আসীন, তাঁহার উষ্ণীষে এক ক্ষুদ্র ধ্যানী-বুদ্ধমূর্তি। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইল, সেই বাসনার নাম প্রজ্ঞা—আদি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা একযোগে



পদ্মপাণি বুদ্ধ

কয়টি ধ্যানী-বুদ্ধের সৃষ্টি করিলেন—সেই সমস্ত সৃষ্টির সহিত নিগূঢ়ভাবে তাহারা সংযুক্ত। অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষ ধ্যানী-বুদ্ধের নাম অমিতাভ। বুদ্ধের মস্তক এক জ্যোতির্শ্মণ্ডলে আবৃত, তাহার বাম হস্তে ধর্মচক্র মুদ্রাচিহ্ন, দক্ষিণ কর উন্মুক্ত, তাহাতে বর মুদ্রাচিহ্ন বিদ্যমান। তিনি ধ্যাননিমগ্ন, দেহের উর্দ্ধভাগ ঋজু, দক্ষিণ পদ এক শতদলের উপর স্থাপিত, সেই শতদল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন। এই মূর্তি যে অধ্যাত্ম শান্তি প্রকাশ করিতেছে তাহা বচনাভীত।

শিল্প ভারত-শিল্পীর ধ্যানের বিষয় ছিল। ধ্যানযোগে শিল্পী যদি তাহার ধ্যেয় বিষয়ের সহিত একাত্ম হইতে না পারিতেন তাহা হইলে কনাচ এমন সত্যশিল্পের উদ্ভব হইত না।

১৩২০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যক প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় “বঙ্গে বুদ্ধমূর্তি পূজা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে বঙ্গীয় ভাস্কর-শিল্পীর রচিত এক বুদ্ধমূর্তির বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় শিল্পীর মানস-নেত্রে ভগবান্ বুদ্ধের কি রমণীয় ধ্যান-সুন্দর মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল পাঠকগণ চিত্রদর্শনে উহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত বুদ্ধমূর্তি অত্য়াপি বিক্রমপুরের অন্তর্গত নলতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে হিন্দুদেবতারূপে পূজিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন—

সাধারণের নিকট মূর্তিটী “চিন্তামণি ঠাকুর” বলিয়া পরিচিত। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অভিধানে চিন্তামণি শব্দের অগ্ণান্য অর্থ ব্যতীত

“বুদ্ধবিশেষ” এইরূপ এক অর্থ লিখিত আছে। কিন্তু মূর্তিটি পূজিত হইতেছে অর্দ্ধ-নারীশ্বর বা হর-গৌরীর ধ্যানে।

প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তিটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি। মূর্তির পাদপীঠে অতিপ্রাচীন বঙ্গাক্ষরে “লোকনাথ সাত্ব্যম্” এই লিপিটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিটি মূর্তির নাম এবং অবস্থা-পরিজ্ঞাপক। লোকনাথ বুদ্ধদেবের নামাস্তুর মাত্র। সাত্ব্যম্ শব্দটি বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ অর্থপরিগ্রহ হইতে পারে। আত্মনো হিতং কৰ্ম্ম—আত্ব্যম্ (আত্মন্ + হিতার্থে যৎ) আত্মেন সহ বর্তমানঃ ইতি সাত্ব্যম্। অর্থাৎ আত্মহিত কৰ্ম্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব। মূর্তিখানির প্রতিলিপির প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ লিপির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিকশিত শতদলোপরি ধ্যানমগ্ন তথাগত উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে যোগানন্দজনিত পবিত্র হাস্য উছলিয়া উঠিয়াছে। মূর্তির দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জামুর উপর দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। ইহাই ভূমিস্পর্শ মুদ্রা নামে খ্যাত। বামহস্তখানি ক্রোড়ের উপর বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। ঐ হস্তের মণিবন্ধে বলয় এবং উর্জ্জনী ও বৃদ্ধাস্থলির অবকাশস্থলে একটা কিশলয় শোভা পাইতেছে, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, বাম স্কন্ধে বিচিত্র উত্তরীয়, মস্তকে প্যাগোডার আকৃতি মনোরম মুকুট। কর্ণভূষণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ললাটে উন্নত টীকা। মূর্তির চাল-চিত্রের উপরিভাগে বিভিন্ন মুদ্রাযুক্ত পাঁচটা ধ্যানী



চিন্তামণি ঠাকুর
(বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি)

বুদ্ধ। দুই পার্শ্বে দুইটী দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। ১৪" x ৮" ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথরের ফলকে মূর্তিটি তক্ষিত হইয়াছে। যে কষ্টিপাথরের ফলকে আঘাত করিলে ধাতুর ন্যায় ঠন্ ঠন্ শব্দ হয় উহাই ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথর।

ভগবান্ বুদ্ধ উরুবেলায় বোধিদ্রুম মূলে যখন সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন মার বিবিধ প্রকারে প্রলোভন প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাকে বোধিমার্গ হইতে স্থলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন মার গোঁতমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যে সম্বুদ্ধ হইলে, তাহার তু কেহ সাক্ষী রহিল না। পরে কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে? তথাগত তদুত্তরে মেদিনী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্মই এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বা সাক্ষীমুদ্রা। মহাবোধিতে এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে এই শ্রেণীর মূর্তির সাধনা বা ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যে পদ্যের উপর ভগবান্ বুদ্ধ সমাসীন তাহার নাম 'বিশ্ব-পদ্য', যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়াছেন তাহার নাম 'ব্রজ-পর্যাক্ষ-সংস্থান'।

মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটিতে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত তাম্রশাসন পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যুগে (খ্রীঃ দশম-একাদশ-শতাব্দীর) বঙ্গলিপি বলিয়া অনুমান করেন তাঁহার অনুমান সত্য হইলে এই মূর্তিটী প্রায় সহস্র বৎসরে প্রাচীন হইবে ।

উল্লিখিত বঙ্গাক্ষরযুক্ত লিপিসন্নিবিষ্ট থাকাতে মূর্তিটী বঙ্গীয় শিলা শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে । মূর্তিটী এমন মন্দির যে দেখিলে বোধ হয় ভাস্কর এইমাত্র উহার অঙ্কন কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন । বঙ্গের বাহিরে বুদ্ধগয়া ও সারণাথে বহুসংখ্যক মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু এমন কমনীয় মুখশ্রী এবং লাবণ্যে তলতল মূর্তি বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না ।

স্তম্ভ

বৌদ্ধশিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রস্তরস্তম্ভ, স্তূপ, বেষ্টিনী চৈত্য ও বিহারে প্রকাশ পাইয়াছে । মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে দেশের সর্ব্বাংশে প্রস্তরস্তম্ভে ধর্ম্ম ও সুনীতিমূলক বহুবাক্য খোদিত করিয়াছিলেন । এলাহাবাদ ও দিল্লীর প্রস্তর-স্তম্ভের লিখিত বাক্যাবলীর পাঠোদ্ধার করিয়াছেন জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব । এলাহাবাদ স্তম্ভে অশোকের খোদিত লিপির তলদেশে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিও দৃষ্ট হয় । সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ-গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষগণের নাম তথায় খোদিত করাইয়া রাখিয়াছেন । এই স্তম্ভ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে একবার ভূমিসাৎ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় । সম্রাট জাহাঙ্গীরও এই

স্তম্ভে তাঁহার রাজত্বের আরম্ভসূচক বাক্যাবলী পারস্যিান ভাষায় খোদিত করাইয়া রাখিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের যে সকল স্তম্ভ এক্ষণে দেখা যায় সেইগুলির শিরোভাগ আলঙ্কারিক কারু-কার্যসহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিহুতের স্তম্ভের শিরোভাগে এক সিংহমূর্তি রহিয়াছে। মথুরা ও কনোজের মধ্যবর্তী সঙ্কাশ্য নামক স্থানের স্তম্ভ এক ভগ্ন হস্তীর উপর স্থাপিত। এই হস্তীর মূর্তি এমনভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ্ ইহাকে সিংহ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটস্থ লৌহস্তম্ভ এক বিস্ময়-সামগ্রী। এই লৌহস্তম্ভের ২২ফিট ভূমির উপরিভাগে, .২০ ইঞ্চি ভূগর্ভে রহিয়াছে, ইহার বেফটন পাদদেশে ১৬ ইঞ্চি, শিরোভাগে ১২ ইঞ্চি। এই স্তম্ভের উৎকীর্ণ বাক্যাবলী পাঠ করিয়া প্রিন্সিপ সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

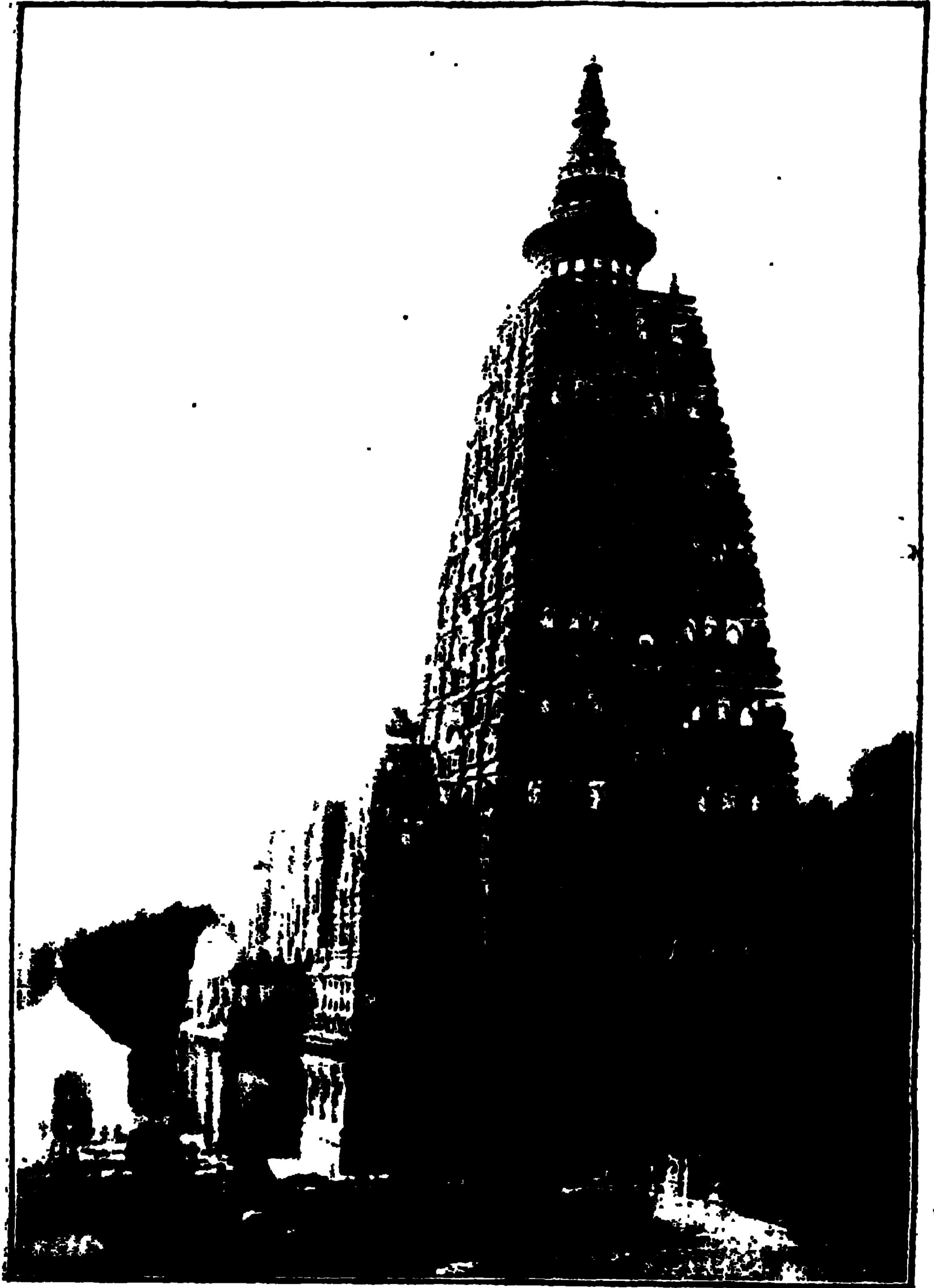
এই স্তম্ভ দর্শনে ইয়ুরোপীয়দিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা যত বৃহৎ, যেমন মসৃণ লৌহদণ্ড প্রস্তুত করিতে জানিতেন উহার বহু শতাব্দী পরেও ইয়ুরোপীয়েরা এরূপ লৌহস্তম্ভ নির্মাণ করিতে জানিতেন না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৌদ্দশত বৎসরের পরেও আজ পর্যন্ত এই স্তম্ভে মরিচা পড়ে নাই, উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেকালের ভারতীয় শিল্পী কি প্রকারে এমন গুণবিশিষ্ট লৌহস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এই

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী বৈজ্ঞানিকদের নিকট এখনও রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবু পাহাড় ও ধর নামক স্থানে প্রাপ্ত লৌহস্তম্ভও বিস্ময়ের সামগ্রী।

কেবল সৌন্দর্য্য বিকাশে নহে, ধর্ম্মের সহিত শিল্পের সংমিশ্রণে বৌদ্ধশিল্প বিশেষ গৌরব লাভ করিতেছে। ভগবান্ বুদ্ধের ধ্যানসুন্দর মুখমণ্ডলের শাস্তোজ্জ্বল শোভা, তাঁহার জন্ম, তাঁহার প্রব্রাজ্যা, তাঁহার মার বিজয়, তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন, তাঁহার পরিনির্বাণলাভ, তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের মহৎ কাহিনী সমস্তই শিল্পীরা শ্রদ্ধাপূর্বক রেখাকরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল তাহা নহে সে কালের জনমণ্ডলা যে সকল ঘটনা সাগ্রহে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিল, যে সকল ঘটনা লোক পরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্ষা পাইয়াছিল এমন বহু ঐতিহাসিক তথ্য শিল্পীরা চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ধরিত্রীর জঠর হইতে যে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে তন্মধ্যে সেকালের ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বহু বিবরণ জানা যাইতেছে। চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে মহামতি অশোক সম্বন্ধে কত আখ্যান, বিজয়সিংহের লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ, লঙ্কার আদিম অধিবাসীদের সহিত বিজয়সিংহের যুদ্ধ, তাঁহার অভিষেক প্রভৃতি আখ্যান অঙ্কিত রহিয়াছে।

স্তূপ ও বেষ্টনী

উরুবিল্ব ভগবান্ বুদ্ধের সাধন-তীর্থ। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্থ-সান্স বলেন, সম্রাট অশোক এই স্থলে সর্ব প্রথমে বিহার নির্মাণ



বুদ্ধ গয়ার মন্দির

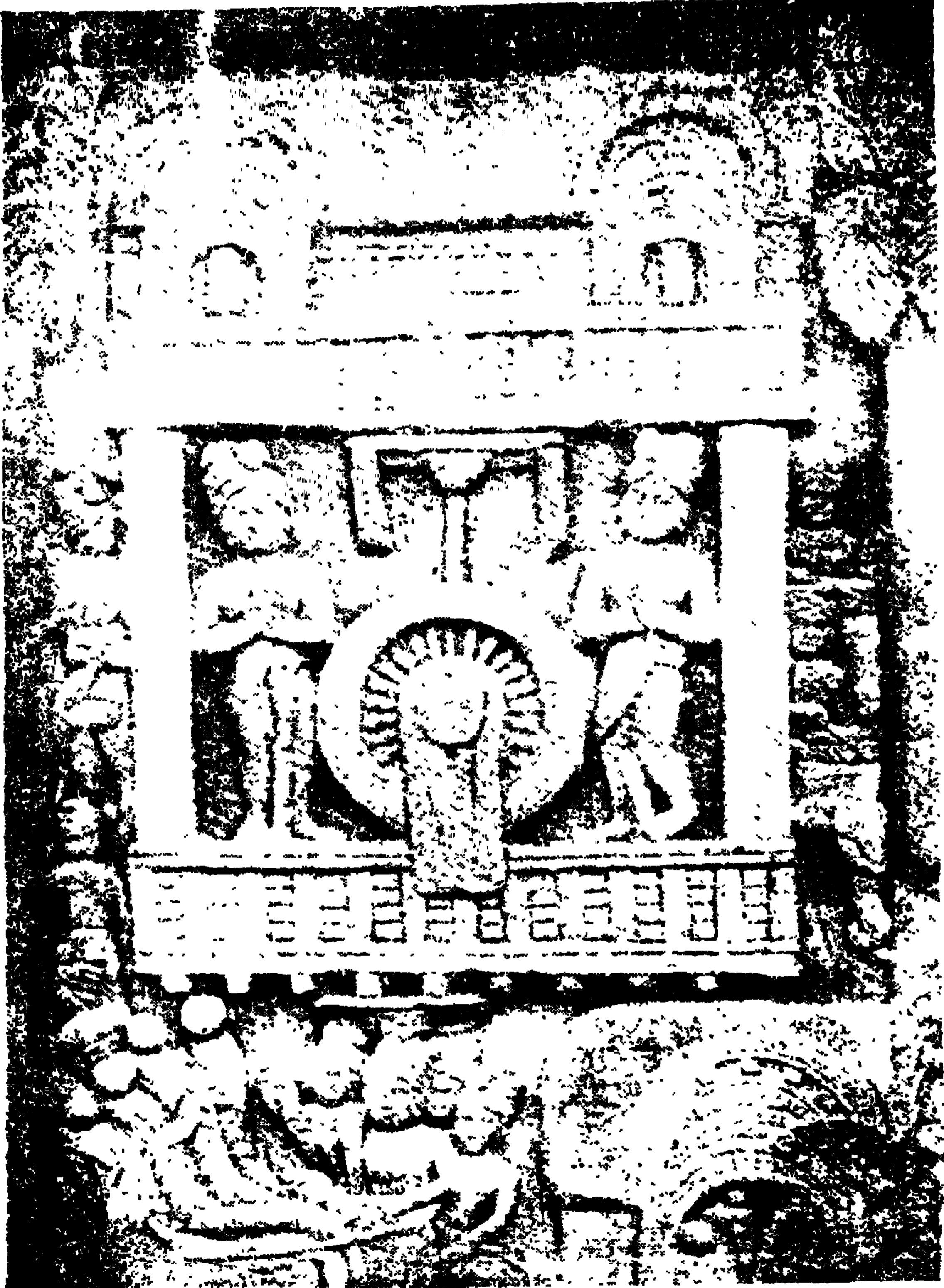
করেন। মধ্যপ্রদেশের ভারহুজ-স্তূপের বেঞ্চনী-স্তম্ভে এই বিহারের যে খোদিত চিত্র দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয়, বোধিজ্ঞানের চারিপার্শ্বে স্তম্ভোপরি প্রস্তরনির্মিত দ্বিতল গৃহ ছিল। গৃহতোরণের পুরোভাগে শিলাস্তম্ভের উপর এক হস্তিমূর্তি খোদিত ছিল। উরুবিল্ব গ্রামের অন্য নাম ছিল মহাবোধি, ঐ নাম অতঃপর বুধগয়ার পরিণত হইয়াছে। বুধগয়ার বর্তমান মন্দির কখন নির্মিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই। যে স্থলে বুধগয়া মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্মিত হইয়াছে ঐ গ্রাম পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ জমির উপর নির্মিত হইয়াছে। এই টিবি মহাবোধির ধ্বংসাবশেষ। ইহার কিয়দংশ খনন করিয়া মহাবোধি মন্দিরের প্রাচীর ও নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির প্রাক্কণ খননকালে দুই একটা প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অনুকরণে আধুনিক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রস্তরনির্মিত সিংহাসনোপরি ভগবান্ বুদ্ধের ধ্যাননিরত মূর্তি রহিয়াছে, তাহাই সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। সিংহাসনের গাত্রে খোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে, হিন্দবংশীয় কোন রাজা এই মূর্তি ও সিংহাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে স্তম্ভ পরম্পরায় বেঞ্চনী নির্মিত হইয়াছিল। অনেক স্তম্ভেই খোদিত লিপি আছে। অধিকাংশ স্তম্ভই এক্ষণে ভগ্ন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিক ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপ ও চৈত্যের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। বুধগয়ার মাঠে তথাকার

আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ ও কারুকার্যময় মন্দির এবং বেষ্টিতমধ্যে যুগ যুগান্তরের শিল্পসাধনামূর্তি পরিগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

সারনাথ

কাশীর অদূরবর্তী সারনাথ এক সময়ে যুগদাব বা ঋষিপত্তন নামে খ্যাত ছিল। এই স্থলে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সদ্ধর্ম্য সর্ব-প্রথমে প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই স্থান বৌদ্ধ মাত্রেয় নিকট পরম পবিত্র পুণ্যার্থে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উক্ত আছে যে, এই স্থলে ভগবান্ বুদ্ধ পূর্ববর্তী কোন অশ্মে যুগরূপ ধারণ করিয়া এক হরিণীকে তাহার শিশু-সন্তানসহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য ঋষিপত্তন বৌদ্ধদের নিকট 'যুগদাব' নামে খ্যাত। এই স্থলে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মূর্তি, স্তূপ ও বিবিধ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমুদয়ের শিল্পশোভা দর্শকমাত্রেয় চিত্তে অপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এইস্থলে যে সকল বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্ত আঞ্জিও নবনির্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদ্মাসন, বীরাসন, রাজাসন ও বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি-গুলির মুখে কি শান্তি, কি পবিত্রতা, কি কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়া রাখিয়াছে তাহা না দেখিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সেই বৌদ্ধযুগের সাধন-নিরত ভাস্করশিল্পিগণ এমন সুকৌশলে এই সকল মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন যে কাল ইহাদের অক্ষয় সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে পারে নাই।



धर्मचक्र

আধুনিক সারনাথ বারাণসী ধামের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। বুদ্ধের সময়ে সারনাথ বারাণসীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার স্বতন্ত্র নাম হয়ত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বুদ্ধ বারাণসীধামে “ধর্মচক্র প্রবর্তন” করেন। বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন,—‘আমি ধর্মচক্র প্রবর্তন জন্ম বারাণসী ঘাইতেছি।’

বৌদ্ধশিল্পিগণ ধর্মচক্রের যে খোদিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা যেমন শিল্পশোভায়, তেমন ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। ধর্মচক্রের সর্ববাংশ সুমঙ্গল প্রস্তরে নির্মিত। আলোকদানবৎ এক স্তম্ভের উপরিভাগে এক চক্র স্থাপিত, ইহার উপরে চারিটি সিংহ দণ্ডায়মান। এই চক্রের উভয়পার্শ্বে দুইটি বৃক্ষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সমস্তের সমবায় ধর্মচক্র বলিয়া কথিত হয়। এই ধর্মচক্র মানবজীবনের জন্মমৃত্যু প্রভৃতি রহস্যের সূচক। উহারই ধ্যান করিয়া মানুষ পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকে। বৌদ্ধ-সাধক ধ্যান করেন ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্মচক্র-প্রবর্তন ও পরিনির্বাণ।

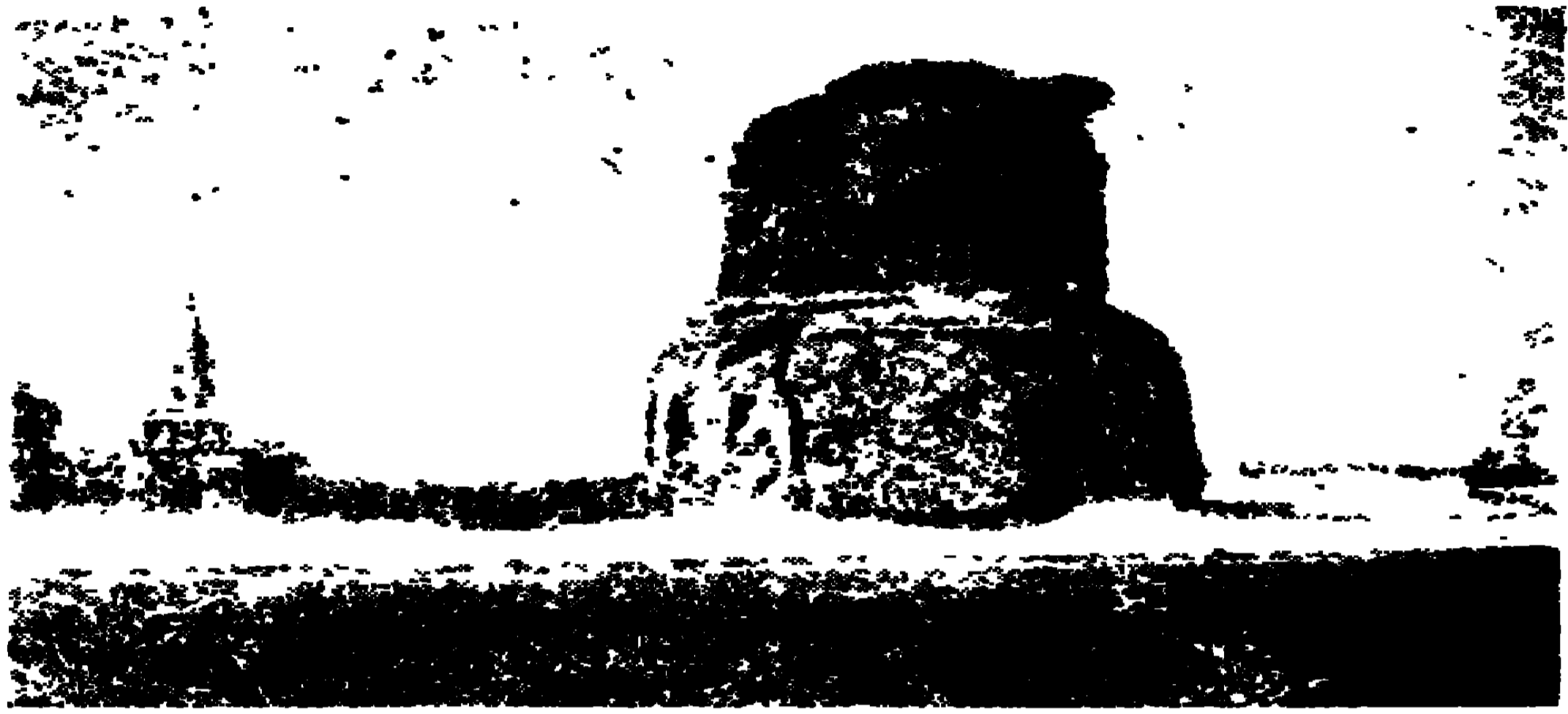
যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ সর্বপ্রথমে পঞ্চশিষ্য সমীপে তাঁহার আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ সদ্ধর্মের কাহিনী বিবৃত করেন তথায় এক স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্তম্ভোপরি এক সিংহমূর্তি এবং উহার গাত্রে মহারাজ অশোকের অনুশাসন রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত মহামতি অশোক ভারতবার্ষর

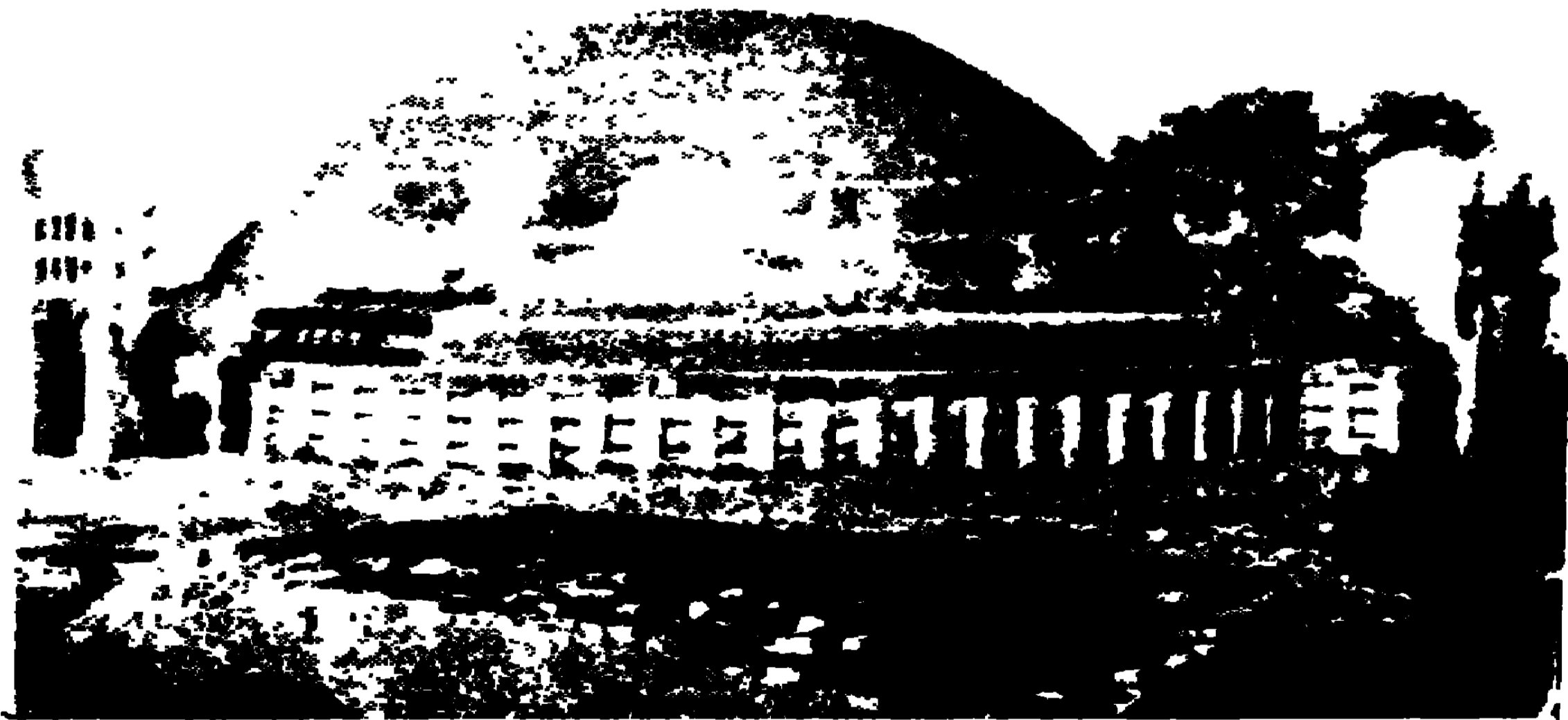
সর্ব অংশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। লোকসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি যেমন ভারতের সর্বত্র ও বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের তথ্য খোদিত লিপি ও চিত্রদ্বারা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া দিয়াছিলেন।

স্তূপ সমূহের শিল্পশোভা বিশেষরূপ হৃদয়স্পর্শী। স্তূপের বেষ্টিতীর তিনটি স্তম্ভ বুদ্ধ, সজ্ব ও ধর্ম এই ত্রিশরণ সূচনা করে। স্তূপের চারিধারে মহাপুরুষ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্মচক্র-প্রবর্তন ও পরিনির্বাণলাভের মনোহর চিত্র রেখাকরে অঙ্কিত থাকে। নীল আকাশ যেমন চক্রাকারে সকল দিক হইতে ধরিত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছে স্তূপের টোপের তেমন উদ্ভিন্ন নীলকমলের দ্বারা নিম্নমুখ হইয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। টোপের তলদেশ হইতে যে পাঁচটি স্তম্ভ উখিত হইয়াছে তাহা বিশ্বের উপাদান ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সূচনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের দেহ ধাতুর উপরে যে বৃক্ষ অঙ্কিত থাকে উহা বোধক্রম-সূচক।

সম্রাট্ অশোক হীনযান বৌদ্ধ ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধকে তিনি মহাপুরুষরূপেই পূজা করিতেন, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতেন না। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব বাহাতে লোকসাধারণের বোধগম্য হয় তত্ত্বজ্ঞান তিনি বুদ্ধের উপদেশ তাঁহার পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী নানা উপায়ে লোকমধ্যে প্রচারিত করিতে



सारनाथ स्तूप



साँचि स्तूप

সচেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইহা মহতের পূজা। হীনযান সম্প্রদায়-
ভুক্ত বৌদ্ধগণ এই ধর্মকে অন্ধ কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা হইতে
রক্ষা করিতে কিরূপ সচেষ্ঠ অশোকের স্তূপাবলীর মধ্যে উহার
পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

সারনাথের ধামেক স্তূপ বুদ্ধগয়ার স্তূপের অনুরূপ। কানিং-
হাম সাহেব তৎপ্রণীত মহাবোধি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—‘এইস্থানে
স্তূপের সংখ্যা অসংখ্য, আখরোটের সদৃশ দুই কি তিন ইঞ্চি
উচ্চ বহুস্তূপ এখানে বিদ্যমান। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বলিলেও
অত্যুক্তি হয় না।’ কালক্রমে অথভে এইগুলি নষ্ট হইয়াছে।
ধামেকস্তূপ মহারাজ অশোক নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান্
বুদ্ধ যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চশিষ্যকে সর্বপ্রথমে ধর্মোপদেশ
দিয়া তাঁহার নবধর্মে দীক্ষিত করেন ‘চৌখণ্ডী স্তূপ’ সেই পবিত্র
ভূখণ্ডে নির্মিত হইয়াছে।

সারনাথের নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের বাহিরে দেশান্তরে
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনেক পরিত্রাজক তাঁহাদের জীবন সার্থক
করিবার জন্য এই স্থলে আগমন করিয়াছেন। চীনপরিত্রাজক
ফাহিয়েন, উয়ানচুয়াঙ, ই-চিঙ এই পুণ্যতীর্থ সম্বন্ধে নানা
কথা লিখিয়াছেন। উয়ান চুয়াঙ যখন সারনাথে আসিয়াছিলেন
তখন তথায় দেড় সহস্র শিকারী বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন
করিতেছিলেন।

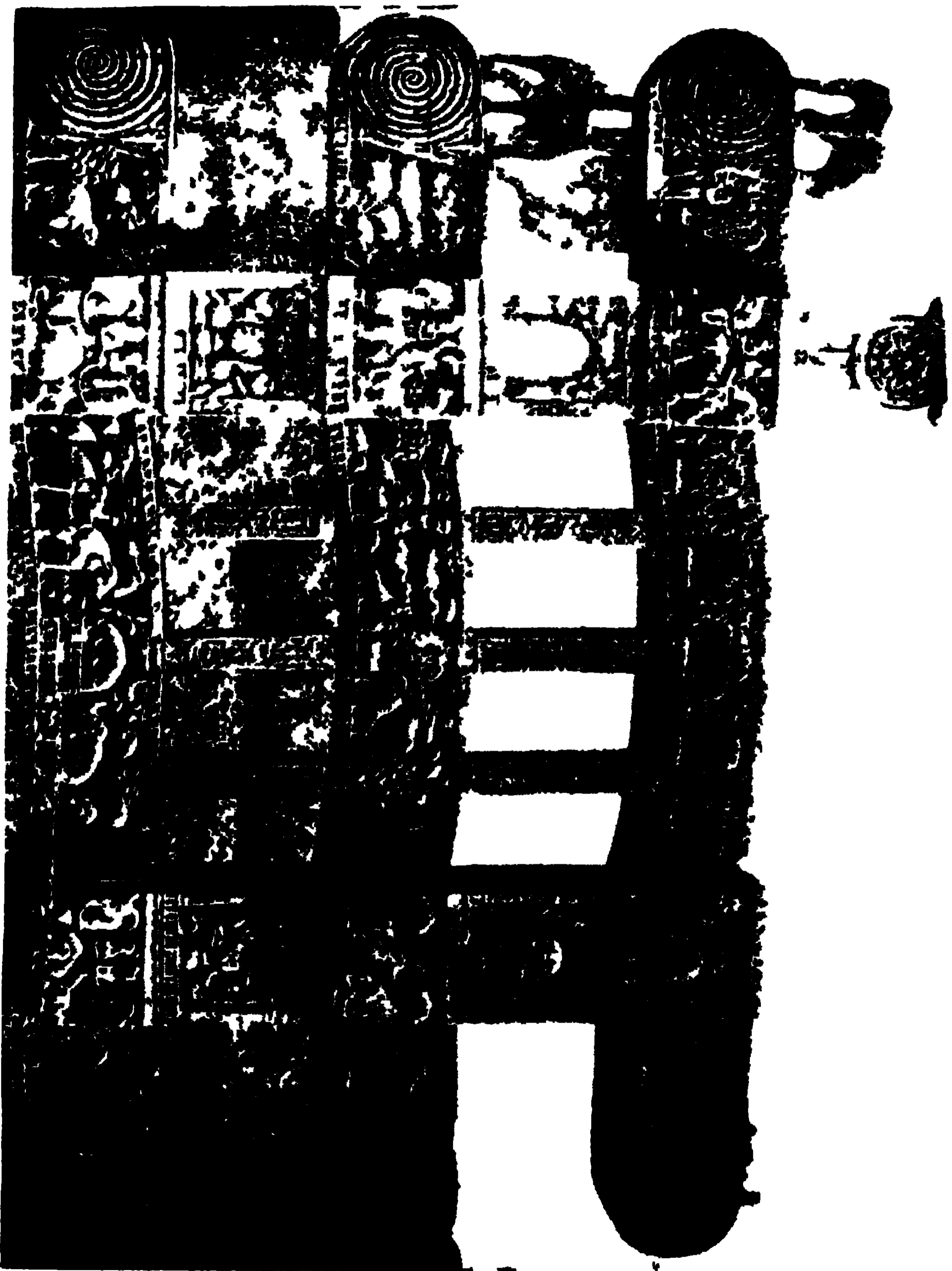
সারনাথে বহুবর্ষ খননের ফলে বৌদ্ধভারতের এক নগরের
জীবন্ত ভূদৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গর্ভ হইতে এক বৃহৎ বৌদ্ধ

বিহার, প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বমূর্তি, নানাপ্রকার বুদ্ধমূর্তি, দাস দাসী, নর্তক নর্তকী, মুটে, মজুর, দারী ও মল্ল-মূর্তি, অসংখ্য প্রকার স্ত্রী মূর্তি, বিবিধ কারুকার্যখচিত প্রস্তরফলক, এমন কি ছঁকা, কলিকা, প্রদীপ, কলসী, মালসা প্রভৃতি দ্রব্য অত্যন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সারনাথের মিউজিয়মে এই সকল দ্রব্য সম্বন্ধে রক্ষিত হইয়াছে। দর্শকগণ তথায় গমন করিয়া বৌদ্ধভারতের শিল্পশোভা ও সমাজ চিত্রের যুগবৎ পরিচয় পাইতে পারেন।

সাঁচি

সাঁচি স্তূপে সম্রাট্ অশোকের এক অনুশাসন লিপি রহিয়াছে। ভূপাল রাজ্যের ভিলসা গ্রামের উত্তর দক্ষিণে ৬ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১০ মাইল মধ্যে বহুসংখ্যক স্তূপ আছে। সাঁচি স্তূপ এই সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাঁচির পুরাতন নাম চৈত্যগিরি। এই স্তূপে কাহার দেহ-ধাতু সমাহিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বৃহৎ স্তূপের চারিদিকে যে রমণীয় বেষ্টিনী রহিয়াছে তদুপরি অশোক যুগের অক্ষরে লিখিত বহু অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া গেল। জেনারেল ক্যানিংহাম বলেন, এই স্তূপ অশোকের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের শোভা বর্ণনা করিয়া ডাক্তার ফাগুসন লিখিয়াছেন,—

এই চারি তোরণের সম্মুখে ও পশ্চাতে বিবিধ কারুকার্য রহিয়াছে। সাধারণতঃ রেখাকরে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা



সাঁচি স্তূপের পূর্বক তৈরণ

খোদিত করা হইয়াছে। এতদুভিন্ন জাতকের বহু আখ্যানও খোদিত রহিয়াছে। সিংহলী পুস্তকে যুদ্ধ, অবরোধ, জয়লাভ প্রভৃতি যে সকল আখ্যান বিবৃত আছে সেই সমস্ত ইতিহাস এখানে রেখাকরে অঙ্কিত হইয়াছে। নরনারীর পানাহার, আমোদপ্রমোদ ও প্রেমের চিত্রও খোদিত রহিয়াছে, তোরণ-সমূহে যে চিত্র খোদিত আছে উহাকে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ শাস্ত্রের চিত্রপুস্তক বলিতে পারা যায়।

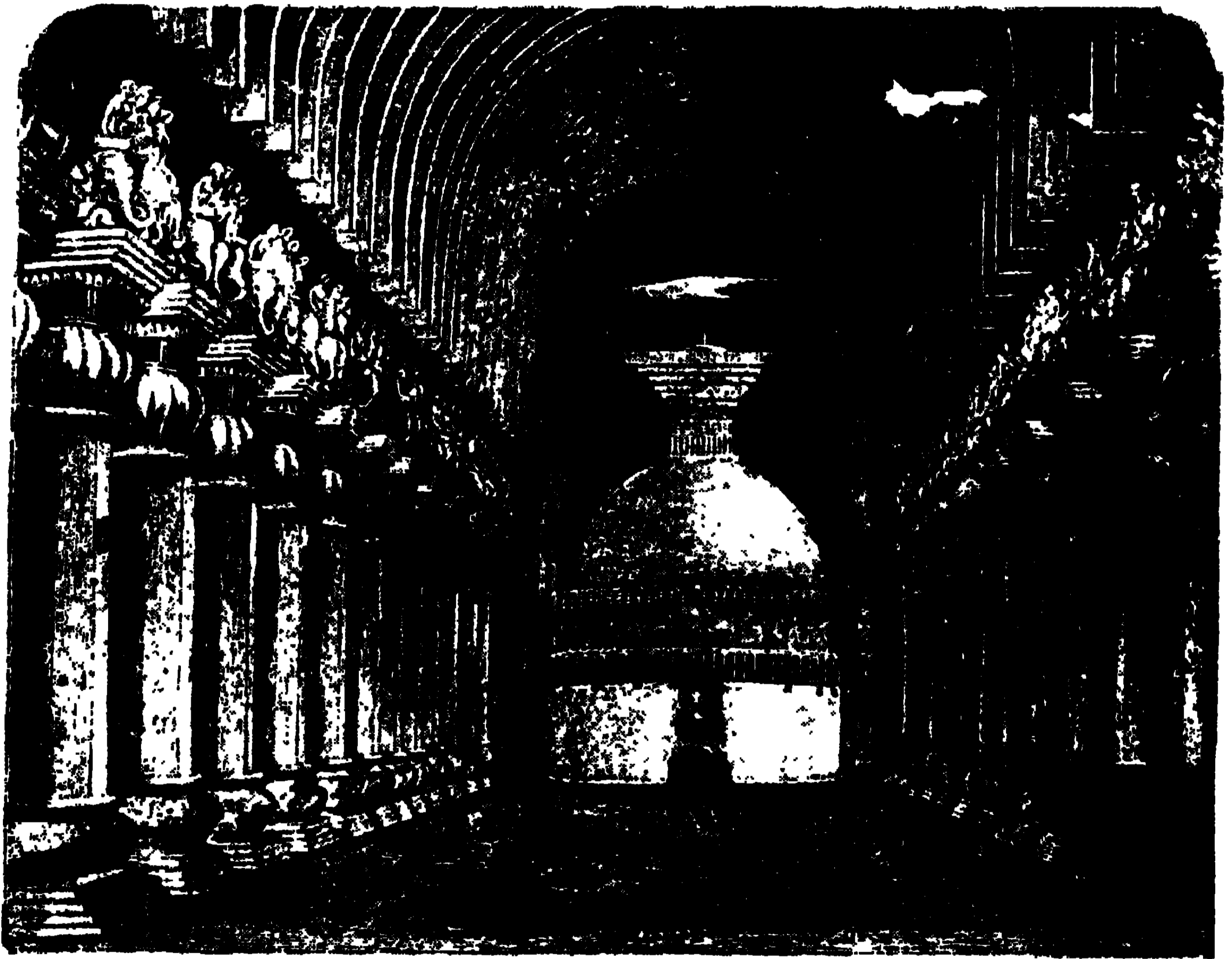
আলঙ্কারিক কারুকার্যে বৌদ্ধযুগের বেষ্ণনী ও তোরণগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ স্তূপ সমূহের চারিদিকেই এই বেষ্ণনী ও তোরণ নির্মিত হইয়া থাকে। এলাহাবাদ ও জব্বল-পুরের মধ্যবর্তী ভারহত-স্তূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী পল্লীর অল্প সাধারণ ঐ স্তূপের বিশেষত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া উহার ইচ্ছক খসাইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজন পূরণ করিয়াছে। বেষ্ণনীর অর্দ্ধাংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

চৈত্য

পর্বতের গাত্র খুঁড়িয়া গুহা-গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বৌদ্ধভিক্ষুগণ তাঁহাদের ধর্ম্য সভার অধিবেশন করিতেন। এই সভাভবনগুলি চৈত্য নামে অভিহিত হইত। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতির অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রু ঐ সভাভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

গুহাভবনগুলির সম্মুখভাগ ব্যতীত অপর কোন অংশ বাহির হইতে দেখা যায় না বলিয়া হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম মন্দিরের মত চৈত্যগুলি বাহ্যতঃ জাঁকাল বলিয়া অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের নানা অংশে বিশেষতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অনেকগুলি চৈত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ বোম্বাই অঞ্চলের পর্বতমালা গুহাখননের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বিবেচিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের সমীপবর্তী উদয়গিরির হস্তি-গুম্ফা, গণেশ-গুম্ফা, রাজরাণী-গুম্ফা এবং ব্যাঘ্র-গুম্ফা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য কিস্বা বিহার। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী ঘরপুরী দ্বীপ হস্তি-গুহাপুঞ্জের নিমিত্ত “এলিকেন্টা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপে চারিটি গুহা-গৃহ আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা ২৫০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে খোদিত হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ১৩০ ফিট। গুহামধ্যে এক ত্রিমস্তক বিগ্রহ বিরাজিত, মূর্তির পুরোভাগে দুইটি খোদিত রক্ষক মূর্তি রহিয়াছে। এই ত্রিমূর্তি বৌদ্ধ-ধর্মের বুদ্ধ, সজ্ব ও ধর্মেরই রূপান্তর। ছাভেল সাহেব বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মূর্তি সূর্যের তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়কালীন সূর্য—তখন বিশ্বকমল মুকুলিত হয়। বিষ্ণু মধ্যাহ্ন রবি—বিশ্ব সমুদ্রের উপর শেষ নাগের শয্যায় শায়িত অনন্ত। শিব অস্তকালীন তামু—অন্ধকার অসুরগণকে দলন করিবার জন্ত তিনি শশি-মৌলী হইয়াছেন। আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও অনুরূপ আদিম সৌরোপাসনার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।



କରାଳୀ ଚେତ୍ର

বোম্বাই পোতাশ্রয়ের সলসোটি দ্বীপের কেনেরী গুহাপুঞ্জ প্রকৃতির নিভৃত রম্য নিকেতনে নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাধু-দিগের দেবায়তন ও বাসভবনগুলি দেখিলে মনে হয় ইহাদের সৌন্দর্যানুভূতি অতি উচ্চ ছিল। কেনেরীতে ১২০টি গুহা আছে। তন্মধ্যে ১৫টি ব্যতীত অপর সকলগুলি এখন এমন পরিষ্কৃত অবস্থায় আছে যে তথায় বসবাস করা যাইতে পারে। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে যখন হিন্দুধর্ম নূতন বলে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তখন ভারতবর্ষের নানাস্থলের বিহার হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধ সাধুগণ কেনেরী দ্বীপের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও এখানে বৌদ্ধ প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। অতঃপর বৌদ্ধ সাধুগণ সিংহল, ষবদ্বীপ এবং চীন প্রভৃতি দেশে প্রস্থান করেন। কেনেরী বিহার এক সময়ে বিদ্যালোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

করালী।

অজস্রায় চারিটি চৈত্য আছে। এলোরার বিশ্বকর্মা গুহাও প্রসিদ্ধ চৈত্য সমূহের মধ্যে শিল্প শোভায় করালীর গুহা সুপ্রসিদ্ধ। ফাণ্ড'সন সাহেব এই করালী গুহার শোভায় মোহিত হইয়া বলিয়াছেন—

করালী বোম্বাই ও পুনার মধ্যবর্তী এক পল্লী, ইহার চারি-দিকের শ্যামল শোভা নেত্রপ্রীতিকর। এই শাস্ত্রসুন্দর পল্লীর নিসর্গশোভার মধ্যে করালীর গিরি-গুহা অবস্থিত। এই চৈত্যটি

ভারতীয় চৈত্য সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য ৮৪ হস্ত, বিস্তার ৩০।০ হস্ত। এই গুহার প্রবেশ পথে প্রত্যেক-দিকে ১৫টি করিয়া অষ্টকোণিক স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের শিরো-ভাগে দুইটি করিয়া নভজানু হস্তী আছে। হস্তীর উপরে দুইটি করিয়া মনুষ্যমূর্তি। সাধারণতঃ একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক, তবে কোন কোন স্থলে দুইটিই স্ত্রীমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। গৃহ-তল হইতে ৩১ হস্ত উর্দ্ধে খিলান করা ছাদ, উহার গম্বুজটি অর্দ্ধ গোলাকার। খিলানের তলে গৃহ মধ্যে এক স্মৃতিমন্দির (dagoba) রহিয়াছে। ইহার উপরে ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে, তদুপরি ধ্বংস প্রায় এক কাষ্ঠছত্র বিরাজিত।

গুহার সম্মুখস্থ সোপান আরোহণ করিলে দ্বিতলের সুপ্রশস্ত কক্ষে গমন করা যায়। তাহার পরে আরও একটি বৃহৎ কক্ষ আছে। এই কক্ষের তিন পার্শ্বে চৌদ্দটি ছোট ছোট ঘর আছে।

করালী গুহার বর্হিভাগে ও অভ্যন্তরস্থ চন্দ্রাতপে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে পাষণ চন্দ্রাতপে ঐরূপ শিল্পনৈপুণ্য আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। এই শিল্পশোভার জন্যই করালী-গুহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কারুকার্যময় ছাদ নষ্ট হইতেছিল, যথাসময়ে উহার সংস্কার সাধিত হওয়ায় এই পুরা-কীর্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ফাণ্ডর্সন সাহেব লিখিয়াছেন—

It would be thousand pities if this which is the only original screen in India were allowed to perish.

অর্থাৎ ভারতের এই একমাত্র মৌলিক চন্দ্রাতপটি নষ্ট হইতে দিলে উহা পরম ক্ষোভের বিষয় হইত।

এই গুহার মধ্যস্থলে ও দক্ষিণ দ্বারের বাম পার্শ্বে ভগবান্ বুদ্ধের পরম রমণীয় খোদিত মূর্তি রহিয়াছে।

বিহার

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান কালে ভারতবর্ষের সর্বত্র অসংখ্য বিহার নির্মিত হইয়াছিল। মগধরাজ্যের সর্বত্রই বিহার ছিল বলিয়া উক্তরাজ্য “বিহার” নাম ধারণ করিয়াছিল। বৈশালীর জেতবন, রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধকুট প্রভৃতি কয়টি ভিক্ষু নিবাসের নাম বিনয়পিটকে দৃষ্ট হয়। মগধরাজ বিম্বিসার বেণুবন প্রমোদ উদ্যান ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবিতকালে বিহার সংখ্যা তত অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পাটনার নিকটবর্তী বনগাঁও গ্রামের নালন্দা বিহার অতি প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙ এই বিহারে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানকার ভিক্ষু-নিবাস সমূহের চতুর্দিকে ১৩০০ ফিট দীর্ঘ, ৪০০ ফিট প্রস্থ এক প্রাচীর ছিল। ঐ প্রাচীর অংশতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীরের বহির্দেশেও অনেক স্তূপ ও মন্দির রহিয়াছে। সারনাথের ন্যায় নালন্দায় একটি মিউজিয়ম আছে। আবিষ্কারলব্ধ দ্রব্যরাজি তথায় শৃঙ্খলা সহকারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। হাজার হাজার বৎসর পূর্বের মৃৎপাত্রগুলি অভয় অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে।

অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের। উহাতে লেখা “শ্রীনালন্দা মহাবিহারী আৰ্য্য ভিক্ষু সংঘস্য।” প্রস্তর ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার বুদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া গিয়াছে। জন্ম হইতে পরি-নির্বাণ লাভ পর্য্যন্ত বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটনা ১০।১২ আঙ্গুল দীর্ঘ, ৭।৮ আঙ্গুল প্রস্থ প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। এখানকার মিউজিয়মে সেই যুগের তগুল রহিয়াছে। তগুলের কতগুলি কৃষ্ণবর্ণ, অপরগুলি এখনও নূতনবৎ শুভ্র। এখানে খনন করিয়া এক স্তূবৃহৎ ভবন উদ্ধার করা হইয়াছে। অনুমিত হয় ঐ গৃহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম ভবন। ইহার দ্বিতলের ছাদ বা প্রাকার নাই। নিম্নতলে ও মধ্যস্থলে স্তূবৃহৎ অঙ্গন। এখানকার ঘর গুলির প্রত্যেকটিতে দুইটি বৃহৎ এবং দুইটি ক্ষুদ্র বাঁধান স্থান আছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিদ্যার্থীরা বৃহৎ বাঁধান স্থলে শয্যা রচনা এবং ক্ষুদ্র বাঁধান স্থলে পুস্তক দ্রব্যাদি রাখিতেন।

অজন্তা

ভারতীয় বিহারসমূহের মধ্যে শিল্পশোভায় অজন্তা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীষুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত “অজন্তা গুহার চিত্রাবলী” শীর্ষক পাঁচটি প্রবন্ধে উক্ত গুহার সর্বপ্রকার চিত্রের আভাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি তথাকার চিত্র

শোভায় মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন—“অজস্তা ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ; সেই পুণ্যতীর্থে না যাইলে ভারতবাসী কোন শিল্পীরই সাধনা পূর্ণ হয় না। এককালে অজস্তার নাম ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অন্যান্য দেশে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অজস্তা এককালে সুরহং বৌদ্ধ মঠ ছিল। ধর্ম্মমঠের স্থান কি প্রকার হওয়া উচিত অজস্তা যাইলে তাহা অনুভব করা যায়। রমণীয় অরণ্যের মধ্যে একটি পর্বতের গায়ে সারি সারি খোদাই করা প্রশস্ত গুহা। নিম্নে স্বল্প-সলিলা প্রবাহিনী। উপরে অরণ্যের শ্যামল শোভা, স্থানটি নিভৃত নির্জন ; সাংসারিক কোলাহল ও অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপযুক্ত স্থান।”

অজস্তা গুহা হাইদরাবাদের নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। এই গুহা ইন্দিয়াদ্রি নামক পর্বতের গাত্রে উৎকীর্ণ। জলগাঁও নামক রেলওয়ে স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ত্রিশ ক্রোশ।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতে মোট ২৯টি গুহা খোদিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কয়টির খনন কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। গুহা-গুলির মধ্যে চারিটি চৈত্য, অপরগুলি বিহার। ইতিহাসজ্ঞেরা বলেন, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে এই সকল খোদিত এবং ১ম হইতে ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত তত্রত্য চিত্রাবলী অঙ্কিত হইয়াছে।

মদীয় সুরহদ্বি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় চিত্রশিল্পের অশ্রুতম পীঠস্থান অজস্তা ভ্রমণ করিয়া

“অজস্তা” নামক পুস্তকে উক্ত গুহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ।
তিনি লিখিয়াছেন :—

“প্রথম প্রথম কোন্টা ছেড়ে যে কোন্টা দেখবো তা ভেবেই ঠিক করতে পারতুম না । মনে হত যেন কি এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে এসে আত্মহারা হয়ে পড়েছি । পরবর্তী সময়ের মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব কখনও হয় নি । মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার ক’রে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় । মোগল চিত্রে আমরা প্রধানতঃ বিলাস ও ক্রীড়ার ভাবই দেখতে পাই । কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেগ ও শাস্তির ভাবে মণ্ডিত । এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে । তা’হলে বুঝতে হবে মোগল শিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধশিল্প শাস্তিময় ।”

“মোগলদের চিত্র রচনা প্রণালী, বৌদ্ধশিল্পীদের চিত্ররচনা প্রণালীর মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে । মোগল শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্নে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন, বৌদ্ধ শিল্পীরা সেটা দুই চারটে সরু মোটা টানে অল্পায়াসে দেখিয়ে দিয়েছেন । বৌদ্ধচিত্র শিল্পীদের এরূপ রেখাঙ্কনের দক্ষতা মোগল কেন পৃথিবীর কোন দেশের শিল্পীদের ছিল কি না সন্দেহ ।”

“অজস্তা চিত্র বর্ণসমাবেশেও মনোহর । তার প্রতিবর্ণ চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে । মোগল কিংবা অন্য কোন শিল্পে

সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না। বৌদ্ধ আর মোগল চিত্র উভয়েরই রঙ্গের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবি গুলির



বাদক দল

কোনটিরই বর্ণের অছাপি কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চির নবীন। অজস্র ছবি দেখলে মনে হয়, এই মাত্র বৃষ্টি কেউ রং দিয়ে গেল।”

“আলঙ্কারিক শিল্প সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও মোগলশিল্পীরা প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা এক বিচিত্র কাণ্ড। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মাথার উপরে একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙ্গান রয়েছে। প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম বিকশিত; আর তার চারিধারে গোল ভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস কিংবা ময়ূর অথবা মৃগাল-দল-মস্থন-তৎপর হাতীর পাল, এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সে গুলির মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সূক্ষ্মতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না।”

“অজন্তা গুহার গাছপালার চিত্রগুলিও নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত তাঁরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভঙ্গী খাড়া করে নিশ্চিন্ত হন না, তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিক ভাবে এঁকে তার পরিচয় দিয়ে দেন অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে হয় না—‘এটা কি গাছ?’”

অজন্তার ১নং গুহায় সৌম্য ও সুন্দরকান্তি ভগবান্ বুদ্ধের গৃহত্যাগের একখানি মনোহর চিত্র আছে। সেই ছবির শোভা যেন ঐ গুহাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধ যে বিশ্বপ্রেমে বিশ্বল হইয়া জগতের কল্যাণ কামনায় সংসার

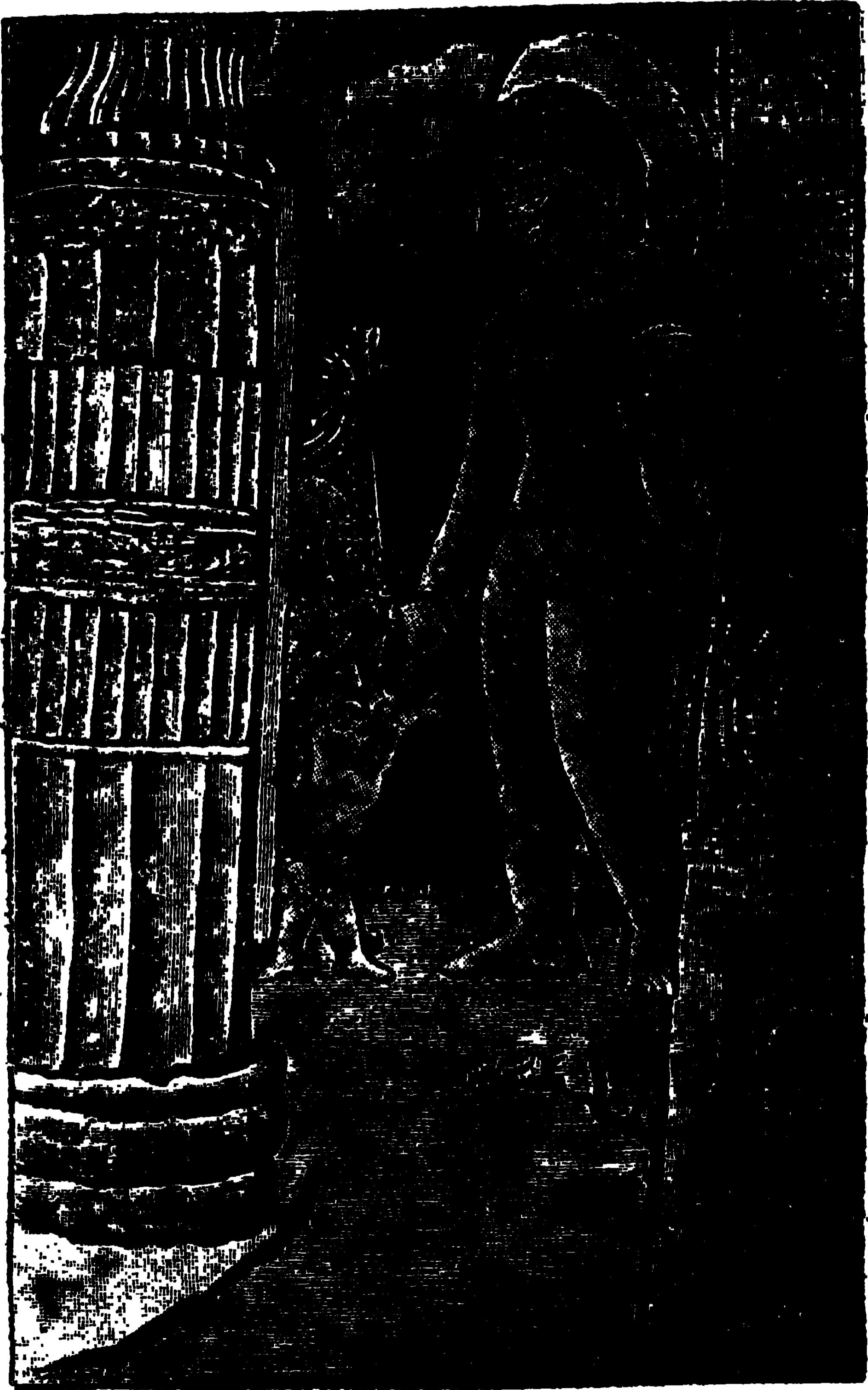
ত্যাগ করিতেছেন তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই গুহার ভগবান্ বুদ্ধের মারজয়ের যে চিত্র আছে তাহাও বিশেষরূপ ভাবব্যঞ্জক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য্য প্রভৃতি রিপুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও বুদ্ধ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার মন শান্তির যে আলোকময় রাজ্যে বিরাজিত, প্রলোভন তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। কাম পরমা সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ করিয়া, মোহ দানববেশে, মদ, মাৎস্য্য প্রভৃতিও নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রলুদ্ধ করিবার জন্ত কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর তপঃপ্রভাবের নিকট ইহারা সকলেই পরাভূত হইল।

অজস্তার ১৭নং গুহা বহু শোভন চিত্রে অলঙ্কৃত। ত্রিখারী বেশধারী ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে সপুত্র জননীর খোদিত ছবিখানি ঐ গুহার সর্বশ্রেষ্ঠ শোভা। উদারমূর্তি দীর্ঘকায় বুদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন, নরনারীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত, তাঁহার অন্তরের সেই অনন্ত করুণা মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ত্রিখারী বেশে এক নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই জননীও পুত্রের হস্তে ভিক্ষার দ্রব্য দিয়া আপনার দুই হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া ভিক্ষা দিতেছেন। ভগবান্ বুদ্ধের ভাববিহ্বল মুখের সৌম্য কান্তি দর্শনে মাতাপুত্র উভয়ে বিস্ময়ে বিকল হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। বালকের মুখে সরলতা ও নির্ভীকতা এবং জননীর মুখে আত্মমিবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।



ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে আশীর্বাদ-প্রার্থী মাতা ও পুত্র ।



ভিকারী ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্র (খোদিত মূর্তি)



[গুহার ছাদের আলঙ্কারিক চিত্র]

অজস্তাগুহায় ভগবান্
বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটনা
এবং বৌদ্ধজাতকের অসংখ্য
চিত্র আছে। ধর্মের যে
সকল কথা ভাষায় প্রকাশ
করিলে জটিল হইয়া উঠিত
চিত্রে ও ভাস্কর্যে রেখাকরে
তাহা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা
করা হইয়াছে। এখানে রাজ-
সভা, যুদ্ধবিদ্রোহ, দাম্পত্য-
প্রেম, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির
অভাব নাই; বহু ঐতিহাসিক
চিত্রও অজস্তায় দৃষ্ট হইয়া
থাকে। সৌন্দর্যের উন্মেষ
জন্য এখানে আলঙ্কারিক
চিত্রকলাও অঙ্কিত হইয়াছে।
কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে
আধ্যাত্মিকতার এক সুর
ধ্বনিত হইতেছে।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী
হইতে বৌদ্ধশিল্পের অভ্যুত্থান
হইয়াছিল। উড়িষ্যার হস্তি-

গুম্ফা, ব্যাঘ্র-গুম্ফা প্রভৃতি বৌদ্ধশিল্পের স্থূল প্রারম্ভ সূচনা করিয়া থাকে। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী হইতে এই শিল্প অসামান্য উন্নতি লাভ করে। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত কয় শত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার নির্মিত হইয়াছিল। এই সকলের শিল্পশোভা দর্শকগণের হৃদয়রঞ্জন করিয়া থাকে। হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে মহা-মানবরূপে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে পরমেশ্বরের আসনে স্থান দান করেন নাই, এই জন্যই বোধ হয় অশোক-যুগের শিল্পের শোভা হৃদয়স্পর্শী হইলেও ঐ যুগের শিল্প গভীর আধ্যাত্মিকতায় মহোচ্চ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অতঃপর মহাযান বৌদ্ধধর্মের যখন ভক্তিবাদ দেখা দিল, মানুষ বুদ্ধ যখন পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন, তখন ভগবান্ বুদ্ধ ভারতীয় শিল্পীর হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, সকল ভক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তখন হইতেই শিল্পীরা তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা মন্দিরে, বিহারে, চৈত্রে, গিরিগুহায় অঙ্কিত করিয়া আপনাদের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভক্তিরসে আপ্নত হইয়া শিল্প উদার, বিশাল ও মহান্ হইয়া উঠিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর পৌরাণিক মন্দিরসমূহে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্পর্শ নিদর্শন রহিয়াছে। তারপর ভারতে

তামসী নিশ্চর আবির্ভাব হইল । সেই তমিস্রার মধ্যে ভারতের
গৌরবময় শিল্প কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইল তাহা এখনও সুস্পষ্ট-
রূপে জানিতে পারা যায় নাই ।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি

বৌদ্ধধর্ম কেন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ধর্মরূপে হিন্দুধর্মের পার্শ্বে ভারতবর্ষে সর্গোরবে প্রতিষ্ঠিত রছিল না, ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্যা। এই উদার মৈত্রীমূলক ধর্ম ভারতীয় আৰ্য্য সভ্যতার উৎস হইতে উথিত হইয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নূতন আকার প্রদান করিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে এই ধর্ম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের পীতবস্ত্রে তখন জম্বুদ্বীপ পীতমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাতশত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের সূনীতি ও দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করিয়া বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় অসংখ্য গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত হইত। বিশ্বয়ের বিষয় এই, যে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থের চিহ্নমাত্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না।

নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে যদি আধুনিক কালের সুধীগণ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে এই কথা বলাও দুর্লভ হইত

যে এই সকল গ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী একসময়ে রচনা করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধের উদারধর্ম্য যুক্তিমূলক। এই মহাপুরুষের ধর্ম্য যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্মশানেই দেহান্তি বিভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুশয্যায়ই তাঁহার শিষ্যগণ যুক্তিমূলক ধর্ম্যে নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া যুক্তির স্ননির্দিষ্ট রেখা হইতে কথঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুপরে তদীয় উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্যসাধনায় নিরত ছিলেন। প্রায় এক শত বৎসর বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ ঘটে নাই। অতঃপর নিয়ম পালন লইয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের মীমাংসার জন্ম বৈশালী নগরে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল কিন্তু বিবাদের মীমাংসা না হইয়া বৌদ্ধগণ স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্গিক এই দুই দলে বিভক্ত হইলেন। জনবলে মহাসাঙ্গিকেরা প্রবল হইলেন। সম্রাট্ অশোক স্থবিরবাদী অর্থাৎ হীনযানী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষণে এই ধর্ম্য সিংহলে প্রচারিত হইয়া অত্যাপি বিচ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে জালন্ধরে মহাসাঙ্গিকদের এক সভায় তাহাদের ধর্ম্যপুস্তক রচিত হয়। এই সময়ে মহাসাঙ্গিক মহাযানরূপে পরিণত হয়। এই মহাযান আবার মজ্জযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজবানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যাভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা ক্রমশঃ খুব বাবু, বিলাসী এবং তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিল।

মহাযান ধর্ম খুব উঁচু ধর্ম। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতে কার্য্য করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা “ধারণী” মুখস্থ কর, ‘ধারণী’ জপ কর, ধারণীর পুঁথি পূজা কর—তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়, যোগ সকলের ফল হইবে। ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট স্বাহা” প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্রকে ধারণী বলে। এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার করা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বৌদ্ধধর্মের দেবতার সংস্রব নাই। দেবতার পূজা অর্চনা-হীনবানে ছিলই না। বুদ্ধের মৃত্যুর ৪৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধ-মূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে এক একটা করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম “অমিতাভ”, তারপর “অকোভ্য,” তারপর “বৈরোচন” তারপর “রত্নসম্ভব,” তারপর “অমোঘ সিদ্ধি,” আসিয়া জমিলেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের

পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম 'লোচনা' 'মামকী,' 'তারা' 'পাস্তুরা', 'আর্য্যতারিকা'। পঞ্চাধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচজন বোধিসত্ত্ব হইলেন। তাহাদের মধ্যে "মঞ্জুশ্রী" ও "অবলোকিতেশ্বর" প্রধান। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন স্মৃতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল। অনেক পদ হইতে লাগিল, অনেক মস্তক হইতে লাগিল। তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধরিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, ষঙ্কিনী, ভৈরব বৌদ্ধগণের উপাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধ দেবতা মনিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারা অধঃপাতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশটা সুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক দিন হইতেই ঘৃণা ধরিয়াছিল। বুদ্ধ নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্ত অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয়শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল

—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই যুগ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল, গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল আৰ্য্য। আসল ভিক্ষুরা আৰ্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু অনাৰ্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের আৰ্য্যেরা নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সম্মানসম্মতি হইত, তাহারা আপনা আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম “ত্রিশরণ” গ্রহণ করিতে হইত। তাহার পর “পুণ্যানুমোদনা” শিখিতে হইত, “পাপদেশনা” শিখিতে হইত, “পঞ্চশীল” গ্রহণ করিতে হইত, “অষ্টশীল” গ্রহণ করিতে হইত, “দশশীল” গ্রহণ করিতে হইত, “পোষধব্রত” ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত। ইহাতে তাহাদের অনেক সময় যাইত, কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিষ অশ্রুকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সে সকল বাড়ীতেই শিখিত, তবে আমাদের যেমন পৈতা একটা সংস্কার মাত্র উহাদেরও ঐ রকম ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ, এক একটা সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন “জাত বৈষ্ণব” বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে, সে কালেও তেমনি “জাতভিক্ষু” বলিয়া একটি জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দল পুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ:

করিত, ভিক্ষাও করিত, কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজ-মিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্যও করিত, পূজাপাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্যটা ক্রমে ক্রমে আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম, ঘরে বসিয়া করা যায়—একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়, দুপয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই সকল কাজই করিত। স্মৃতরাং তাহাদের ধর্ম্য করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যান-ধারণা করা, ভাবনা চিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না, তাহা হইলে মোট দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্যটা মুর্থ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমি-জমার আয় হইতে কোনরূপে গুজরাণ করিতেন ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপণ্ডিত হইলে যে রাজ-সম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধপণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিতেন না; স্মৃতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত বর্ণনা হইতে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি সুস্পষ্ট

হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, কিন্তু এই অবনতি বা বিকৃতির জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে ইহা যুক্তি-পূর্বক স্বীকার করা যায় না। বিকৃতি কোন ধর্মকে ইহার যথার্থ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, নেড়া-নেড়ীরা যেভাবে বৈষ্ণবধর্মের আচরণ করে উহার দ্বারা মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের প্রেমের ধর্মের বিচার করা যায় না। ইন্দ্রিয়াসক্ত তথাকথিত বৌদ্ধদের পঞ্চম-কার সাধনা নির্বাণ-বস্ত্রা বুদ্ধের মৈত্রী-মূলক সদধর্মকে গৌরবচ্যুত করিতে পারে না।

তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল পাপাচার চরিত্রহীন বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোক সাধারণের মনে বৌদ্ধসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। বৌদ্ধসমাজ ধর্মবলহীন হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে Sir Charles Eliot তৎপ্রণীত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে বলিয়াছেন —

The aberration of Indian religion is not due to its inherent depravity but to its universality. In Europe those who follow dis-reputable occupation rarely suppose that they have anything to do with church. In India robbers, murderers gamblers, prostitutes and maniacs all have their appropriate gods.

ভারতীয় ধর্মের অবনতি এই ধর্মের কোন মৌলিক

দুর্বলতার জন্ম ঘটে না, ইহার প্রকৃত কারণ ধর্মের সার্বজনীনতা। ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি স্থগিত ব্যবসায়দ্বারা জীবিকার্জন করে, ধর্মসমাজের সহিত তাহাদের কোন যোগ আছে এমন কথা কদাচিৎ তাহাদের স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে দস্যু, হত্যাকারী, প্রতারক, পতিতানারী, এমন কি পাগলও ইহাদের সকলে আপন আপন রুচি অনুসারে ঈশ্বর মানিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম উদারভাবে এই ধর্মের পতাকাভলে সকলকে আশ্রয় দান করিয়াছিল, ইহা এই ধর্মের সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার হেতু হইলেও মহত্বব্যঞ্জক।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থানই বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ। নব ধর্মবল-দৃপ্ত মুসলমান আক্রমণকারীরা বৌদ্ধদের মন্দির ও চৈত্য ধ্বংস করিয়া সেই সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল মুসলমানদের এই আক্রমণই বৌদ্ধধর্মকে দেশ ছাড়া করিয়াছে ইহাও স্মৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানেরা একমাত্র বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তি বিনষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা হিন্দু-মন্দির ও হিন্দুদেবদেবীর বিগ্রহ চূর্ণ ও বিকলাঙ্গ করিয়াছিল। মুসলমানদের আক্রমণের ভীষণতা হিন্দুধর্ম সহ্য করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম উহা সহ্য করিতে পারিলেন না কেন? বস্তুতঃ মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল।

মুসলমানেরা যখন ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল তখন হিন্দু-ধর্ম ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবল মন্দিরমধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই মুসলমানেরা মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম নির্মূল করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে স্যর চার্লস্ ইলিয়ট লিখিয়াছেন—But where as Hinduism was spread over the country, Buddhism was concentrated in the great monasteries and when these were destroyed there remained nothing outside then capable of withstanding either the violence of the Moslims or the assimilative influence of the Brahmins.

তখন হিন্দুধর্ম দেশব্যাপী ছিল কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্ম বড় বড় মঠে আবদ্ধ ছিল সেইজন্য মঠগুলি যখন ভগ্ন হইল তখন এই ধর্মের মুসলমানদের উৎপাত এবং ব্রাহ্মণদের আত্মস্ব করিয়া লইবার উদার প্রভাবের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার আর সাধ্য রহিল না।

বৌদ্ধগ্রন্থে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ নির্যাতনের উল্লেখ আছে। ঐ নির্যাতন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। নিখিল ভারতের বা ভারতের কোন বৃহৎ অঞ্চলের হিন্দুগণ কদাচ সাম্প্রদায়িকভাবে বৌদ্ধদিগকে দলন করে নাই বরং ইহাই বিন্ময়কর সত্য ঘটনা যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সহস্রাধিক বৎসর মিত্রভাবে পাশাপাশি বাস করিয়াছেন। ইয়ুরোপখণ্ডে প্রোটেষ্ট্যান্ট

খৃষ্টানেরা রোমান কাথলিক খৃষ্টানদের দ্বারা যেমন ভাবে লাঞ্চিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে ধর্ম্মমত লইয়া তদ্রূপ শোণিতপাত ও হত্যা-কাণ্ড কদাচ ঘটে নাই। যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য সর্ব্বম্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই সুবিখ্যাত বৌদ্ধভূপতি অশোক তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ-সাধু ও ব্রাহ্মণ উভয়কে তুল্যরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে।

বৌদ্ধনির্ঘাতক বলিয়া ঐহারা কুকীর্্তি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল, বঙ্গাধিপ নরপতি শশাঙ্ক এবং পুষ্যমিত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের ব্যক্তিগত সাময়িক অত্যাচার কদাচ সাম্প্রদায়িক আকার পরিগ্রহ করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসর মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দার্শনিক ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমত এবং চরিত্রের প্রভাব লোকসাধারণের উপর পতিত হইয়াছিল। লোকমণ্ডলী দলে দলে ইহাদের মতানুবর্তন করিয়া হিন্দুসমাজে নববলের সঞ্চার করিতে লাগিল। শঙ্করের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যে সকল সুধা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্্তন করিতেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মের উচ্চনীতি বরণ করিয়াই ইহাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন। ভগবান্ বুদ্ধ বিষ্ণুর অন্ত্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃত

হইয়াছেন। আর্য্যসভ্যতার বিশাল বন্ধ হইতে যে তরঙ্গ, পর্বত-সমান উত্থিত হইয়াছিল সেই তরঙ্গ উক্ত সভ্যতার সহিতই বিলীন হইয়াছে। বুদ্ধের আর্ষ্টাগ্নিক সাধনামূলক ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, উহা নিখিল ভারতের চিরন্তন উদার ধর্ম্মমধ্যে স্বীয় স্বতন্ত্র-সত্তা মিশাইয়া দিয়াছিল। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাই, সেই সকল দেশে এই ধর্ম্ম-মহীকর্ষের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রচুর অবকাশ আছে। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অধ্যাত্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভারতভূমিতেই অবিনশ্বরভাবে বিদ্য হইয়াছে এবং এই 'দেশই উক্ত ধর্ম্মকে এখনও নব নব আকার দান করিবে। ভারতের ভূমি খনন করিয়া এখন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধমন্দির আবিষ্কার করিতেছেন। সাধকগণ ভারতের অধ্যাত্মভূমি খনন করিলে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন যে, বৌদ্ধসাধনা এই দেশে যে শিকড় বিদ্য করিয়া রাখিয়াছে, উহা কোন দিন শুকাইয়া মরিয়া যায় নাই।

সাধন-ভজন হীন ও বিদ্যা-বিনয়শূন্য কারিগর বৌদ্ধেরা যখন সমাজের প্রভু হইল, ইহাদের ব্যভিচারে, অনাচারে যখন বৌদ্ধ-সমাজের প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইল, তখন নবধর্ম্মবলদীপ্ত মুসলমান আক্রমণকারীরা এই যুগে-ধরা সমাজমন্দিরের উপর অবিমূষ্যভাবে আঘাত করিয়া ইহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল। যে জীর্ণদীর্ণ মন্দির আপনি পতনোগ্রস্ত হইয়াছিল,

মুসলমান আক্রমণকারীরা উহার শীঘ্র পতনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিল।

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপরেও উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল।

লামা ভারনাথ তৎপ্রণীত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন— মুসলমানদের আক্রমণে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংস হইবার পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়েন। এই কারণে ভারতবর্ষে নানা অংশে বহু শিলালিপি পাওয়া যাইতেছে। মুসলমানদের মগধ জয়ের পরেও দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, ও রাজপুতনায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। ঐ সকল রাজ্যে তান্ত্রিকতার চর্চা হইত। মহাপ্রভু চৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত তত্রত্য বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বিচার হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে এমন কথা এখনও বলা যায় না। চট্টগ্রাম জিলায় এখনও বহু বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। উড়িষ্যায় এখনও এই ধর্মের চিহ্ন রহিয়াছে। সার চার্লস ইলিয়ট লিখিয়াছেন,—

The Saraks of Baramba, Tigaria and the adjoining parts of Cuttack describe themselves as Buddhists. Their name is modern equi-

valent of Sravaka and they apparently represent an ancient Buddhist community which has become a sectarian caste. They have little knowledge of their religion but meet once a year in the cave-temple of Khandagiri to worship a deity called Buddhadeva or Caturbhuja. All their ceremonies commence with the formula Ahimsa parama-dharma and they respect the temple of Puri which is suspected of having Buddhist origin.

কটক জিলার বরন্থা, তিগরিয়া এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের শারকগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ‘শারক’ এই নাম ‘শ্রাবক’ নামের আধুনিক প্রতিশব্দ হইবে এবং সম্ভবতঃ শারকগণ প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু এক্ষণে এক স্বতন্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাদের কোন বোধ নাই কিন্তু বৎসরে একবার বুদ্ধদেব বা চতুর্ভুজ নামক দেবতার আরাধনার নিমিত্ত খণ্ডগিরির এক গুহায় সমবেত হইয়া থাকে। “অহিংসা পরম ধর্ম” এই শীলটি দ্বারা তাহাদের সর্বপ্রকার ধর্ম্যানুষ্ঠানের আরম্ভ সূচিত হইয়া থাকে। ইহারা পুরীর মন্দিরকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অনেকে সন্দেহ করেন যে, ঐ মন্দির পূর্বে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল।

বাংলাদেশে বীরভূম জিলার রামপুরহাটের নিকটবর্তী খর-
বোনা ও বলেরপুর গ্রামে এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত
সাদিপুর, শিলাগুড়ি, জয়তারা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়ি
প্রভৃতি স্থানে শরাক জাতীয় লোক আজকালও বাস করিতেছে।
ইহাদের উপাধি—হদ্দ, রক্ষিত, দত্ত, প্রামাণিক, সিংহ, দাস
ইত্যাদি। ইহারা মাছমাংস খায় না, সুরাপান করে না। পণ্ডিত
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—ইহারা পূর্বের বৌদ্ধ ছিল
তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে বৌদ্ধধর্মও ইহার স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিতে না পারিবার
আরও একটি কারণ আছে। এই দেশে বৌদ্ধধর্ম যখন পূর্ণ
গৌরবে বিরাজিত ছিল তখনও গৃহী বৌদ্ধগণ জাত কর্ম, শ্রাদ্ধ,
বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে স্ব-স্ব পূর্ব আচার রক্ষা করিয়া
চলিত। ইহারা ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু সামাজিক
ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকে কোন স্বতন্ত্র মণ্ডলীভুক্ত বলিয়া বুঝিতে
পারা যাইত না। বৌদ্ধেরা সঙ্ঘের বাহিরে কোন মণ্ডলীগঠনের
চেষ্টা করেন নাই, ইহাই তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার
বিরোধী হইয়াছিল। সার চার্লস্ ইলিয়ট লিখিয়াছেন—
It aimed not at founding a sect but at including
all the World as lay believers of easy terms.
This principle worked well so long as the faith
was in the ascendant but its effect was disastrous
when decline began. The line dividing Buddhist

lay-men from ordinary Hindus became less and less marked.

বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গঠনের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। এই ধর্ম সহজ সর্ভে বিশ্বশুদ্ধ লোককে গৃহী বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্ম যতদিন উন্নতির অভিমুখে চলিতেছিল ততদিন এই নীতি অনুসরণে সফলই ফলিয়াছিল। কিন্তু এই ধর্ম যখন অবনতির অভিমুখে যাইতেছিল তখন ইহার ফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। তখন আর সাধারণ হিন্দুর সহিত বৌদ্ধ গৃহীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক রেখা পরিলক্ষিত হইত না।

একদিকে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের আবেষ্টন রচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেন নাই; অন্যদিকে ভারতীয় আৰ্য্য সমাজ ইহার চিরন্তন প্রকৃতির প্রভাবে বৌদ্ধদিগকে ইহার বিরাট জঠরে গ্রহণ করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়াছিল। এই দুইয়ের সমবায়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু আচারে পরিণত হইল, বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইল।

বুধগয়া মন্দিরের আধুনিক ব্যাপার আলোচনা করিলেই বৌদ্ধমন্দির কিরূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বুধগয়া মন্দিরের বর্তমান ভূস্বামী হিন্দু মোহন্ত। তিনি প্রাথমিক মুসলমান আক্রমণকারীদের মত বুদ্ধ-মূর্তি বা মন্দির ধ্বংস করিতে চাহেন না। তিনি চান মন্দির ও আগ-

স্তুক তীর্থযাত্রীদের উপর ভূস্বামিত্ব করিতে। তিনি হয়ত বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক চিহ্নে চিহ্নিত করিবার অভিলাষী। যে সকল হিন্দু তীর্থযাত্রী গয়াধামে পিণ্ডদান করিতে যান তাহাদের কেহ কেহ বোধিদ্রুমমূলেও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। বুধগয়া অতি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া এখানে বিদেশ হইতে এখনও বহু অহিন্দু যাত্রী আসিয়া থাকেন। তাহা না হইলে এতদিনে বুধগয়া হয়ত সর্বতোভাবে হিন্দুতীর্থে পরিণত হইত।

উল্লিখিতরূপ যুক্তি দেখাইয়া সার চার্লস্ ইলিয়ট বলেন,—

The same process went a step further in many shrines which had not the same celebrity and effaced all traces and memory of Buddhism.

বুধগয়ায় যাহা ঘটিয়াছে উহার অপেক্ষা অপ্রসিদ্ধ বহু বৌদ্ধ মন্দিরে তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ অধিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। উহার ফলে ঐ সকল মন্দির হইতে বৌদ্ধচিহ্ন ও বৌদ্ধস্মৃতি চিরদিনের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভারতের অনার্য্য সমাজ, অনার্য্য সভ্যতা যে প্রকারে আর্য্য সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আর্য্যসভ্যতাকে নব আকার দান করিয়াছে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাকে নূতনত্ব দান করিয়াছে।

সার চার্লস্ ইলিয়ট বলেন :—

In reviewing the disappearance of Buddhism

from India we must remember that it was absorbed not expelled. The result of the mixture is justly called Hinduism, yet both in usages and beliefs it has taken over much that is Buddhist and without Buddhism it would never have assumed its present shape. To Buddhist influence are due for instance, the rejection by most sects of animal sacrifices : the doctrine of the sanctity of the animal life, monastic institution and the ecclesiastical discipline found in Dravidian religion. We may trace the same influence with more or less certainty in the Philosophy of Sankar.

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের তিরোধান আলোচনা করিবার সময়ে আমরাগিকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই, এই দেশের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে যে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে উহাই যথার্থতঃ হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নামে যাহাই হউক এই ধর্ম অনেক বৌদ্ধ আচার ও ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সহিত সংমিশ্রণ না হইলে হিন্দু ধর্ম বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা বলা যায় যে, এখন যে, হিন্দুদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় জীববলির বিরোধী,

ইহার মূলে বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে। 'প্রাণীহিংসা করিব না' ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সাধুদের মঠ এবং দ্রাবিড়দেশীয় পুরোহিত শাসনের মধ্যেও বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে। একেবারে অসংশয়ে না বলিতে পারিলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে, শঙ্করের দার্শনিক মতের মধ্যেও বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে।

—

গ্রন্থকার-প্রণীত
বুদ্ধের জীবন ও বাণী

প্রকাশক

ইন্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, কলিকাতা

কাপড়ে বাঁধাই, ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট, কয়েকখানি চিত্র আছে

মূল্য—বারো আনা মাত্র

প্রবাসী বলেন :—এই গ্রন্থে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের জীবনযুগান্ত ও তাঁহার অমৃতমধুর উপদেশ-বাণী অতি শৃঙ্খলায় ও সাবধানে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের অতি উপাদেয় ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে, “ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর এক রূপ। এই দুই রূপে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন! সত্যের জরীপে মহাপুরুষদের চরিত্র ষায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি সেচনে অনেক সময় ষায় পচিয়া। এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্যের জন্ত গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, অথচ শুদ্ধ মহাপুরুষের জীবনকে প্রাণহীন করাও হইবে না, বড় কঠিন ব্রত।”

এই কঠিন ব্রতে গ্রন্থকার সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। নিরপেক্ষ শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতা দ্বারা অপ্রমত্তভাবে তিনি বাধাতথ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা একাধারে অসাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন—“গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তুই বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।” এই গ্রন্থে সাধারণতঃ অপরিজ্ঞাত অনেক নূতন তথ্য ও মত, বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে যেন একটি বৌদ্ধ আবহাওয়া বহিয়া গিয়াছে বলিয়া বড়ই মনোরম ও

সুখপাঠ্য বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা সংযত, মার্জিত, সরস, প্রাজ্ঞ। এই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

The world and The new Dispensation says :—“Babu Sarat Kumar Ray has done a useful service to the community by bringing out a work in faultless diction which presents to the reader a well-balanced view of the religion of Gautama.”

শিখগুরু ও শিখজাতি

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, কলিকাতা

বহুচিত্রে শোভিত, উৎকৃষ্ট বাধাই পুস্তক

মূল্য—১।।০

The Modern Review Says :—

The book is admirably planned and is not marred by preconceived notions. It is happily free from all bias—especially is it not disfigured by that anti-foreign feeling to which some enthusiastic latter-day authors are prone, when they speak of the Maratha and the Sikh communities in the days of their glorious independence.

All the leading Sikh Gurus have been distinctly sketched. The language is quite modern, simple and chaste, is not at all spotted with Sanscritist phraseology and the narrative flows on unimpeded by prejudice or predilection. The introduction is the chief feature. * * * * The rise, growth and fall of the Sikh power have been traced with a master's hand and the real causes of its decay have been analysed with unsurpassable skill.

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন—আপনার পুস্তকে ঐতিহাসিকোচিত সংঘম ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতার অভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার প্রয়াসে বাঙ্গালা সাহিত্য একখানি বাক্যাড়ম্বরশূন্য, তথ্যপূর্ণ ও ধারাবাহিক ইতিহাস-গ্রন্থ লাভ করিল। শিক্ষার্থীগণের পক্ষে ইহা শিক্ষাপ্রদ হইবে।

শিবাজী ও মারাঠাজাতি

মূল্য—আট আনা মাত্র

ভারতী বলেন—কিরূপে একটি জাতি গঠিত হয়, কোন্ কোন্ শক্তি ও

ঘটনা দ্বারা তাহার অভ্যুত্থান ও পতন হয়, কিরূপে একটা জাতির ব্যবস্থা-বিধি, আচারব্যবহারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন প্রবাহিত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রণালী, অধিকারবিধি প্রবর্তিত, পরিবর্তিত ও পরিণত হয়, ইহাই ইতিহাসের কঙ্কাল (constitutional history)। মারাঠাগণ কিরূপে সহস্রা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, কিরূপে বিভিন্ন দলগুলি সম্মিলিত হইল, কিরূপে শিবাজী মারাঠাদিগের এই অভ্যুদয়ে আপনার ঐশীশক্তি নিয়োজিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেন, নিরক্ষর শিবাজীর প্রতিভা কোন্ কোন্ উপায়ে প্রকাশের প্রকৃষ্ট পথ পাইল, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়া, খণ্ডিত অংশগুলিকে সংযোজিত করিয়া কিরূপে এক সমগ্র জাতি গঠন করিল, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লইয়া শরৎবাবু গ্রন্থখানিকে নীরস করিয়া তোলেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্যেরও যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। আফজলখাঁর হত্যাবর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি শিবাজীচরিত্রের ছরপনের কলঙ্কমোচনে সফল হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি উপদেশের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া মারাঠা ইতিহাসের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যবিভাগে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যথেষ্ট আদরের সামগ্রী। ভরসা করি, সাধারণ্যে ইহার বিশেষ সমাদর হইবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষড়নাথ সরকার, এম এ, মহোদয় লিখিয়াছেন :—‘শিবাজী ও মারাঠাজাতি’ পড়িলাম। আপনার প্রয়াস প্রশংসনীয়। আপনি শুধু ঘটনাবিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মারাঠা ইতিহাসের উপদেশগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মারাঠা জাতি কিরূপে বড় হইল, কেন তাহাদের পতন হইল, নেতাদের চরিত্র ও শাসন-প্রণালী এবং তাহার ফল, জাতির উপর দেশের ভৌগোলিক অবস্থার ও অতীতের প্রভাব,—এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আপনার বইখানিকে

পূর্ণাঙ্গ ও উপদেশপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

‘প্রবাসী’ বলেন :—বহু জ্ঞাতব্য নূতন তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইবে। মহাত্মা শিবাজীর মহৎ চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। ইহাতে শিবাজীর রাজত্ব, তাঁহার বংশধরদিগের বৃত্তান্ত ও পেশোয়ারদিগের শাসন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে একটি দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত, একটি নেশন-সংগঠনের চেষ্টার ইতিহাস পাওয়া যাইবে। দেশের রাষ্ট্রশক্তি উদ্ধৃদ্ধ হইয়া যে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করে তাহাই প্রকৃত নেশনের ইতিহাস। তাহার স্মৃতিপাত মারাঠারাই করিয়াছেন। এই শুভপ্রচেষ্টা কেন নিফল হইল তাহারও কারণ এই পুস্তকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সাধক

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস্

উৎকৃষ্ট বাধাই, ছাপা ও কাগজ উত্তম, কয়েকখানি চিত্রে শোভিত

মূল্য—বারো আনা মাত্র

‘প্রবাসী’ বলেন :—ইহাতে বুদ্ধ, রামানন্দ, নানক, কবীর, রবিদাস ও রামমোহন এই ছয় জন সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ধর্মজগতের কার্যকলাপ, উপদেশ-বাণী প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত স্বচ্ছ সাধুভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৪ খানি চিত্র—বুদ্ধ, নানক, কবীর ও রামমোহন—সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা যুবক, ছাত্র ও বয়স্ক ব্যক্তি সকলেরই নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

‘ভারতী’ বলেন :—এই গ্রন্থে বুদ্ধ, রামানন্দ, কবীর, নানক, রামমোহন প্রভৃতি সাধকবর্গের কর্মজীবনী, উপদেশ-বাণীসমূহ এবং ধর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল ;

আলোচনার পদ্ধতি ও যুক্তির সমাবেশ সুনিপুণ। আলোচনার কোথায়ও একটু গোড়ামি নাই ; —ইহাই গ্রন্থের বিশেষত্ব। এই গ্রন্থে বুদ্ধ, নানক, কবীর ও রামমোহনের চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ধর্মসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে।

বঙ্গগৌরব

শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এ

মূল্য—আট আনা মাত্র

আদর্শ-চরিত্র গুরুদাস বাবুর জীবনী বাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলের পাঠ করা উচিত।

“শিক্ষার ক্ষেত্রে, আইন-ব্যবসারে, বিচারপতিরূপে গুরুদাস বাবুর বিশেষত্ব এবং তাঁর সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।” (প্রবাসী)

“শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু এই মহৎ জীবনের ঘটনাবলী এমন সরল ও সুন্দর-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, পড়িলে আশ্চর্য্য বোধ হয় ; এমন অল্পায়াতন পুস্তকের মধ্যে শ্রী গুরুদাসের সর্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার কর্ম-বহুল জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। শরৎ বাবু সমস্ত কথাই বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। :কুদ্র হইলেও পুস্তকখানি সর্বত্র সম্পূর্ণ। (ভারতবর্ষ)

“The author, who, it is understood, had the opportunity of coming into contact with the saint-like man, has given a nice character-sketch in the little book. His penmanship has finely drawn out the prominent features of the great man's life and, it may be pertinently remarked, has fully illumined them. Such a book is a precious contribution to the Bengali literature.” (*The Servant.*)

“The book is written in chaste Bengali and deals with every aspect of the life of the late lamented patriot. The author has beautifully reconciled the stoic rigidity and the child-like simplicity of the character. His educational and social views have been fully delineated in the book.”
(*The Amrita Basar Patrika*)

The prolific pen of Babu Sarat Kumar Ray, a veteran journalist and a litterateur of no mean order, has produced the brief life-sketch of the late Sir Gooroodas Banerjee. We congratulate the author on being able to write it with such consummate skill for presenting it before the young generation of the country. Sarat Babu is an adept in making his subject interesting and his language is pure and not saddled with clethora of dry stuff.”—*The Bengalee*.

This book, well printed and nicely got-up, is an excellent production.—*The Indian Daily News*.

চরিত্র

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস্

উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ উত্তম, কয়েকখানি চিত্রে শোভিত

মূল্য—দশ আনা মাত্র

এই পুস্তকে সংকল্প, অধ্যবসায়, কর্তব্যবোধ, প্রতিজ্ঞাপালন, সাধুতা, সংসঙ্গ, সহিষ্ণুতা, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, পরোপকার, রোগি-সেবা, অতিথি সেবা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গুণাবলী সরল ভাষায় সুন্দর দৃষ্টান্তসহকারে বিবৃত হইয়াছে। শিশুদের চরিত্র-গঠনের উপযোগী এমন উপাদেয় পুস্তক আর নাই। এই পুস্তক প্রত্যেক শিশুর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

‘প্রবাসী’ বলেন :—বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। এই বইখানির মধ্যে কয়েকটি চরিত্র বেশ সহজ ভাবে ও ভাষায় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। দেশী এবং বিদেশী কতকগুলি মহৎ চরিত্রের সমাবেশে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বালক বালিকারা এই পুস্তক পাঠে উপকার পাইবে, আশা করা যায়। আমরা ইহার প্রচার কামনা করি।

পঞ্চকন্যা

মেয়েদের হাতে দিবার মত একখানি

অতি উপাদেয় পুস্তক

চারিখানি ছবি আছে, উত্তম কাপড়ে বাঁধাই

মূল্য বারো আনা মাত্র

The book contains life stories of five notable women ancient and modern. The author is master-hand in portraying character-sketches and his life of late Justice Gurudas Bondopadhaya and other books have already secured for him a place among Bengali litterateurs. In this volume he has most felicitously delineated what we may call "the essence of womanhood". The book in this age, when problem of women's rights and duties are agitating every society will be an excellent guide to our countrymen. We like to see the book extensively circulated among the girls of our country (*Servant*).

পুত্চরিত্রা পুণ্যশীলা এই সব নারীদের চরিতকথা আমাদের মেয়েদের পাঠকরা খুব উচিত। তাহাতে চিত্ত উদার, চরিত্র উন্নত, মন পবিত্র ও স্বভাব সুন্দর ও সেবাপটু হয়। গ্রন্থকার এই সুযোগ দিয়া সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।

ছেলেদের বই

মূল্য ছয় আনা

প্রাপ্তিস্থান—গুপ্ত ব্রাদার্স

১৬ নং শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই লাল টুকটুকে বইখানি কিনিয়া ছেলে মেয়েদের হাতে দিতে ভুলিবেন না। ১০ খানি সুন্দর ছবিতে বইখানি ঝলমল করিতেছে। যে সকল গল্প আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উচিত এই বইখানিতে সেই সমস্ত গল্পই আছে। মহাভারত, রামায়ণ, হরিশ্চন্দ্র, কুব, প্রহ্লাদ, একলব্য প্রভৃতি পৌরাণিক এবং জাতকের চারিটি আখ্যান এই পুস্তকে রহিয়াছে। পুস্তকের ভাষা এমন সরল যে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে।

প্রাপ্তিস্থান—গুপ্ত ব্রাদার্স

১৬নং শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

